হিন্দু-সমাজের মুখপত্র

আলোচনা

ঊনবিংশ বর্ষ, ঊনবিংশ ভাগ।

সম্পাদক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

"আলোচনা-সমিতি"—১০৮ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য ১৷৷০ টাকা। মাশুল ।০ আনা।

১৩২২ সালের সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীকালীকায়ৈ নমঃ।

আলোচনা।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

উনবিংশ বর্ষ। | বৈশাখ, ১৩২২ সাল। | ১ম সংখ্যা।

নববর্ষের আবাহন।

আবাহন করেছিনু তোমা' নববর্ষ,
আমরা যতেক ভারত সন্তান।
দেখিতে দেখিতে পুরাতন যেতে
আসিয়াছ তুমি বিধির বিধান॥
এ নব বরষে নবীন হরষে,
হরষিত কর ভারত প্রাণ।
নবীন উল্লাসে প্রণব বিকাশে
হৃদয় মন্দিরে ধরুক তান॥
মধুময় দেশে মধুময় মাসে,
মধুময় হ'ক মধুর উল্লাসে,
পাপিয়ার তানে আনন্দের গানে,
আনন্দ আসিবে মোদের দেশে।

কি দিয়ে পূজিব তোমা নববর্ষ,
এনেছি সুবাস কুসুম ডালা।
পাঠক পাঠিকা হইয়া সদয়
ধরুন হৃদয়ে শেফালি মালা॥
করি দৃঢ় মন, এস বন্ধুগণ
দশের সেবায় হইয়া রত।
পরহিত তরে, স্বার্থ হানি করে,
উদ্‌যাপন করি স্বদেশ-ব্রত॥
বিভু পদ স্মরি, দিবস শর্ব্বরী
এ-শুভ কাজে করিলে মনন ;—
অবশ্য সফল, হইবে সকল,
অনা'সে হবে ব্রত সংপূরণ।

নববর্ষের কর্ত্তব্য।

বিশ্বসৃষ্টি যেমন আদি অন্ত বিহীন, এই আদ্যন্তহীন ভগবৎ সৃষ্টির মধ্যে যেমন কোথাও কোন বিচ্ছেদ বিরাম নাই, যেমন কোনও বাধা বিঘ্ন ইহার স্বাতন্ত্র্য বিধান করিতে পারে না, তেমনি এই সৃষ্টি প্রপঞ্চের প্রথম প্রভাত হইতে আজ পর্য্যন্ত জন্মমৃত্যু যাতায়াতকে ঠিক সমভাবে রাখিয়া, তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ সার্থক করিয়া যে মহাকাল আমাদের সম্মুখে অসীম অনন্তপ্রভাব বিস্তার করিয়া অপ্রতিহত গতিতে কেবলই চলিয়াছে—যাহার অবিরাম গতির কিছুমাত্র বিরাম নাই; তাহার গতিরোধ করিয়া স্বতন্ত্র করাও আমাদের অসাধ্য। কে বলিবে—কোন মহা মহেন্দ্রক্ষণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে এবং কোন কালবেলায় ইহার নিবৃত্তি হইবে?

কালস্রোত চিরদিন অবিরাম অনন্ত প্রবাহে প্রবহমান। ইহার নিবৃত্তি নাই, ইহার উৎপত্তি নাই—ইহার সীমা পরিসীমাও মানব-ধারণার অতীত। এই অসীম কালকে ধারণা গণনার মধ্যে আনিবার জন্যই সসীম মানব ইহাকে দণ্ড, পল, দিন, মাস, বৎসর আখ্যায় আখ্যায়িত করতঃ বিভাগ করিয়া লইয়াছে। এই জন্য এক বৎসর পরে অপর বৎসর তাহাদের নিকট নূতন; নতুবা কালের আবার নূতন পুরাতন কি,—ভাল মন্দ কি? তবে মানবের এই ধারণা গণনানুসারে কাল সময়ে সময়ে আপনাকে বিচিত্র বেশ-ভূষায় বিভূষিত করিয়া, নিত্য নূতন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শে আমোদিত করিয়া আমাদের মর্ম্ম-দ্বার উদ্‌ঘাটন করে, আমাদিগকে নূতন অমৃত উৎসের আস্বাদ প্রদান করে বলিয়াই আমরা জগৎ সংসারটাকে প্রাণহীন পূতিগন্ধময় ক্লেশাগার বলিয়া মনে করি না, আমরা তাহারই নব জাগরণে জাগ্রত হইয়া আনন্দে দিশাহারা হই। অসীম কালকে আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে রাখিয়া নূতনরূপে অবলোকন করি—ইহাই আমাদের নব বর্ষ; এই নব বর্ষের প্রথম প্রভাত হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র, অতি আনন্দময় শুভ দিন। এই শুভ দিনের শুভ অরুণোদয়ে বাঙ্গালীর নববর্ষের সূচনা। হৃদয়ের কত শুভ কামনা ভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমরা সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি তাকাইয়াছিলাম। আজ নববর্ষের শুভ প্রথম বাসর সেই ভবিষ্যতের প্রবেশদ্বারে আমাদিগকে লইয়া আসিল। জীবনে কতবার এইরূপ দ্বার প্রবেশ করিয়াছি, ভবিষ্যতকে অতীতে নিক্ষেপ করিয়াছি, কত পুরাতনকে নূতনে মিশাইয়াছি কিন্তু আশা ত কই মিটে নাই, কামনা ত কই কমে নাই, আকাঙ্ক্ষার ত কই পরিসমাপ্তি হয় নাই? এক আশা পূর্ণ হইতে না হইতে আর এক আশা সহস্র ধারে হৃদয় কন্দরে প্রবেশ করিয়া পূর্ণ করিয়া ফেলে, কাহার প্রতীক্ষা করে না, আশা পূরণের জন্য ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা নিষ্ফল কারণ আশার পূরণ কখন হয় না, কখন হইবার নহে। আশা আকাঙ্ক্ষা জীবনে যতশীঘ্র পূর্ণ না হয়—ততই; জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের উৎসাহ বাড়ে, কর্ম্মে আত্মদান হওয়া যায়, নতুবা অনায়াসেই যদি সকল আশা আকাঙ্ক্ষার ফল লাভ হয়, তাহা হইলে জীবন স্রোতে যে ভাটা পড়িয়া যায়—উৎসাহ নদীর তীব্র বেগ যে কমিয়া আসে।

জগতে ঘাত প্রতিঘাত সহ্য না করিয়া মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হইতে হইলে আশা আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র না করিয়া সুউচ্চ মহান ভাবে পরিণত করিতে হইবে। ছোট আশা লইযা দুই দিনে তাহা পূর্ণ করিয়া লইলে আর মনুষ্যত্বের বিকাশ হইল কই? যে মানবেব আশা বড—সেই বড় লোক, সেই বড় মানুষ—নতুবা দুই একটী উপাধিব ছাপ বা দুই দশ হাজাব মুদ্রার মালিক হইলে তাহাকে বড় বলা যায় না।

নববর্ষ সেই সুমহান্ আশা-আকাঙ্ক্ষাব উৎস প্রবল বেগে খুলিয়া দেয় বলিয়াই ইহা আমাদেব নিকট শুভ বলিয়া বিবেচিত, মঙ্গলের নিদান বলিয়া অনুভূত। গত বৎসর যাহা পূরণ করিতে পারি নাই, এ বৎসব তাহা পূবণ করিব, এ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহাকে আযত্ত করিবার চেষ্টা করিব—এই একটা তীব্র উৎসাহ-স্রোত হৃদয়-কন্দরে প্রবাহিত করিয়া দেয় বলিযা নূতন বৎসর আমাদের নিকট এত মঙ্গলদায়ক—তাহার আগমনে তাই আমরা এত ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গন্তব্য পথটাকে পবিত্র করিয়া লই।

বিগত ১৩২১ সাল অতীতেব ঘনান্ধকারে মিশিয়া পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে—নূতন ১৩২২ সাল আমাদের সম্মুখে নব কলেবরে উপস্থিত—ইহার সমাদর, ইহার সদ্ব্যয় করিতে আমরা বাধ্য। নব বর্ষ সম্মোহনরূপে সমাগত—ইহার কনক-কিরণে জগত উদ্ভাসিত আলোকিত। ইহার প্রভাত বায়ু দিগন্তের সুষমা একত্র করিয়া প্রাণে প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করিতেছে, কোকিল কোকিলার ললিত প্রভাতী কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছে। এই সুন্দর প্রভাত সময়ে এস আমবা সকলে প্রবুদ্ধ হইযা নূতন কর্ম্মে দৃঢ় নিয়োজিত হই। অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত, আমাদের কর্ত্তব্য অনেক কিন্তু সময় অল্প, বিঘ্ন বহু, ইহা হৃদয়-গ্রন্থিতে দৃঢ় গ্রন্থিত করিযা আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

বৎসরে বৎসরে লোকের অভিজ্ঞতা বাড়ে বই কমে না। যে যত বৎসরের বড়, তাহার অভিজ্ঞতা তত বেশী। আমরা এতাবৎ কালের অভিজ্ঞতায় বুঝিযাছি যে, কেবল পুঁথিগত লেখা পড়ায় আর আমাদের কোন কাজ হইবে না। সে কাজের সময় চলিয়া গিযাছে। যখন দেশে কেরাণী উকিল, মোক্তার প্রভৃতির অভাব ছিল, তখন এ সকলেব আবশ্যক ছিল। এখন নূতন ধরণের শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। এখন পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য বিদ্যা শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। ইহাই এখন নিরন্ন বঙ্গবাসীর অন্ন সংস্থানের পথ সুগম করিতে সমর্থ, শুধু চাকুরী, ওকালতী বা মোক্তারীতে আর কিছু হইবে না। এক্ষণে মাতৃভাষার প্রচার করিয়া শিক্ষার পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। যে জাতির মাতৃ-ভাষার উন্নতি নাই,যে জাতির জাতিয়ত্ব নাই—সে জাতি মৃত। এক্ষণে পল্লীতে পল্লীতে যাহাতে প্রাচীন ধরণের পাঠশালা প্রতিষ্ঠা হয়—তাহা করিতে হইবে। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত পল্লীকে ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে; দেশে দেশে কূপ খনন, জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করিতে

হইবে। পল্লী-জীবন উন্নত না হইলে দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত। দেশের অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট দূর করিতে হইলে, নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে পল্লীগুলিকে ধনধান্যে পূর্ণ করিতে হইবে। নতুবা অপর কিছুতেই দেশের উন্নতি হইবে না। যাহাতে খাঁটি, টাট্‌কা জিনিষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা করিতে হইবে। স্বাস্থ্য রক্ষার ইহাই প্রথম ও প্রধান উপায়। এসকল কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে হইলে সমবেত শক্তির আবশ্যক, ত্যাগী ও কর্ম্মী লোকের প্রয়োজন। যতদিন আমাদের হৃদয়ে আবার পূর্ব্বের ভাব জাগরিত না হয়, যতদিন না আমরা নিজের ঘরে ফিরিতে পারি, এককথায় যতদিন না আমরা ঋষিদিগের শিক্ষা, তাঁহাদের আদর্শ, আবার দেশে প্রচলিত করিতে পারি, ততদিন আমাদের শ্রেয়ঃলাভের উপায নাই। তাহাদিগের সমস্ত কার্য্যই আমাদের উন্নতির সোপান, অপর আদর্শ আমাদের উন্নতির বিরোধী, ইহাই হৃদয়ে বদ্ধ-মূল করিতে হইবে। ধর্ম্ম ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে কখন দেশের কাজ করিয়া দশের উন্নতি করিতে পারা যায় না। তাই বলি, এস ভাই, যাহার যেটুকু শক্তি, নিস্বার্থভাবে তাহা প্রদান করিয়া দেশের কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। সৎউদ্দেশের সহায় মা মঙ্গলময়ী আমাদের সহায় হইবেন। আমাদের হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করিয়া সকল কার্য্যে সাফল্য প্রদান করিবেন।

এস নববর্ষ, আজ আমরা তোমাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করি, তুমি "আলোচনাকে" আর একটী শুভ বৎসরে প্রবেশ করাইলে, সে আজ অষ্টাদশ বর্ষ কেবল ধর্ম্মের কথা, দেশের কথা বলিয়া আসিয়া আজ শুভ ১৩২২ সালের বৈশাখে উনবিংশ-বর্ষে পদার্পণ করিল। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে পরিচালিত "আলোচনা"যে এই সুদীর্ঘ কাল দেশের সেবা করিয়া আসিয়াছে, দশের সুখ্যাতিভাজন হইয়াছে, সে কেবল জগজ্জননী মায়ের আশীর্ব্বাদে এবং ইহার প্রাণস্বরূপ গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকগণের সহানুভূতিতে। তাই আজ আমরা নববর্ষ সমাগমে মহামায়ার চরণপ্রান্তে কোটী কোটী প্রণাম করিতেছি। এবং যাহারা আমাদের এই সৎকার্যে সহায় স্বরূপ সেই গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গকে যথাযোগ্য নমস্কার, আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিয়া পুনরায় কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইলাম।

আলোচনার আত্মকথা।

বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রসঙ্গে সকল দ্রব্যের মুল্য অতিরিক্ত বাড়িয়াছে। এই জন্য "আলোচনা" প্রকাশেও আমাদের খরচ বাড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি আমরা ইহার মুল্য বাড়াইলাম না।

এ বৎসর যাহাতে "আলোচনার" অপরাপর বৎসর অপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা করিব। এইজন্য গ্রাহকগণের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি, তাহারা যেন প্রথম সংখ্যা পাইবামাত্রই আমাদের সামান্য সাহায্য ১৷৷০ টাকা পাঠাইয়া দেন বা ভিঃ পিঃ করিতে পত্র লেখেন। গ্রাহক বেশী হইলে আমরা এবার ১৷৷০ টাকা মুল্যে যতদুর সম্ভব পত্রিকা ভাল করিব, এই জন্য সকলের নিকট অনুরোধ—তাহারা যেন প্রত্যেকে ২।১ জন করিয়া গ্রাহক করিয়া দিয়া আমাদের

এই সৎকার্য্যে সাহায্য করেন। সমবেত শক্তি না হইলে কোন কার্য্যের উন্নতি হয় না—এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এইজন্য আমাদের গ্রাহকগণের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা—তাহারা যেন গ্রামস্থ বন্ধুবর্গকে ইহার গ্রাহক করিয়া দিয়া আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন ও তাঁহাদের মহত্ব প্রকাশ করেন। "আলোচনা" তাঁহাদেরই, ইহার উন্নতি অবনতির ভার তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত। আমরা ভারবাহী, কেবল ভরবহন করিব। বার্ষিক ১॥০ টাকা মূল্যে ইহার অপেক্ষা অধিক আড়ম্বরের কাগজ বাহির হইতে পারে না। ইহার আর্থিক উন্নতি যেরূপ বর্দ্ধিত হইবে—অপরাপর উন্নতিও সেইরূপ হইবে—তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

সম্পাদক।

—

ধর্ম্মালোচনা।

ধৃ ধাতুর উত্তর মন প্রত্যয়যোগে ধর্ম্মপদ নিষ্পন্ন। ধৃ অর্থ—বিধারণ। যাহা কর্ত্তৃক জগৎ, জগৎবাসী মানব, মানবের সমাজ বিধৃত, তাহা ধর্ম্ম। এক কথায় যাহা বিধারক, তাহাই ধর্ম্ম। জগৎ সৃষ্টির যাহা ধারক—নিয়ামক, তাহারই নাম ধর্ম্ম। যাহা থাকিলে সমাজের অস্তিত্ব, সৃষ্টির স্থিতি, মানবের কল্যাণ, গুণের বিকাশ—তাহাই ধর্ম্ম। যাহা বিশ্বের সামঞ্জস্য রাখে, বিরোধের সমন্বয় করে, অভ্যুদয়ের কারণ হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম বলে।

ধর্ম্মের ব্যাপক অর্থ সকলকেই মানিতে হয়। কোন একটী বিশেষ ধর্ম্ম না মানিলেও ব্যাপক ধর্ম্ম মানেন না, এমন ব্যক্তি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে থাকিতে পারেন না। অতি বড় নাস্তিক,—যিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, শাস্ত্রে অশ্রদ্ধ, সমাজরক্ষায় উদাসীন,তিনিও ধর্ম্ম না মানিয়া থাকিতে পারেন না।

প্রথম ধরা যাউক, ধর্ম্মই স্বভাব বা প্রকৃতি। মানবের অস্তিত্বের সহিত তাহার স্বভাব বা প্রকৃতির অস্তিত্বও অবিসংবাদিত। যখন মানব আছে, তখন মানবের স্বভাব বা প্রকৃতিও আছে। স্বভাব বা প্রকৃতি, মানবের বিশেষণ-স্থানীয়। ধর, নীলপদ্ম; নীল এস্থলে পদ্মের বিশেষণ। পদ্ম বিশেষ্য। স্বভাব বা প্রকৃতি-শূন্য মানবের সত্ত্বা নাই; মানব কেন, যাবতীয় দ্রব্যেরই সত্ত্বা নাই। এস্থলে স্বভাব বা প্রকৃতি মানবের বিশেষণ; মানব—বিশেষ্য। বিশেষণ বিশেষ্যে সমবেত। ধর্ম্মও ধর্ম্মীতে বিদ্যমান। মনুষ্যত্ব মানবের ধর্ম্ম; গোত্ব গোর ধর্ম্ম। মানব ব্যতীত অপর জীব, এমন কি,জাতপদার্থমাত্রেরই স্বভাব বা প্রকৃতি বর্ত্তমান। বলিয়াছি, প্রকৃতি বা স্বভাবই ধর্ম্ম। এই বিশ্বে প্রত্যেক জড়পদার্থেরও যে একটী ধর্ম্ম আছে,তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অসংখ্য তরুলতার স্থিতি, কীট-পতঙ্গের জন্ম, প্রত্যেক বালুকণার কার্য্য, প্রতি দুর্ব্বাদলের উদ্দেশ্য, প্রতি অণুটির উপকার দেখিয়া কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে,উহাদের কোন প্রকৃতি বা ধর্ম্ম নাই।

স্বভাবঃ। ভাব পদার্থ মাত্রেরই অস্তিত্ব, স্থিতি বিদ্যমান। ঐ অস্তিত্ব, স্থিতি কোথাও ধর্ম্ম, ঐ অস্তিত্ব স্থিতির কারণটি কোথাও ধর্ম্ম,

আবার ঐ অস্তিত্ব স্থিতির কার্য্যও কোন কোন স্থলে ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম বিশেষণ। ধর্ম্ম বিশিষ্ট ধর্ম্মী বিশেষ্য। এই ধর্ম্মেরই পৃথক পৃথক অংশের পৃথক পৃথক নাম; যথা—প্রকৃতি, গুণ, উপাধি, ক্রিয়া ইত্যাদি। আকাশের, বাতাসের, অগ্নির, জলেরও যাহা স্বভাব, যাহা গুণ, তাহাই তাহাদের ধর্ম্ম। প্রবহন, দাহ প্রভৃতি বাতাস ও অগ্নিরই ধর্ম্ম।

ক্রিয়া বা কর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলে। জড়ের যাহা ক্রিয়া বা কার্য্য, তাহাই জড়ের ধর্ম্ম। মানবের কর্ম্মমাত্রেই ধর্ম্ম। ব্যবহারের সুবিধার্থ—শুভকর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অশুভকর্ম্মকে অধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। শুভ অশুভ বুদ্ধি মাত্রেই বুদ্ধি; তথাপি বুদ্ধিমান্ বলিতে প্রশস্ত বুদ্ধিশালী ব্যক্তিকেই বুঝিতে হয়। পুণ্য কর্ম্মেরই নাম ধর্ম্ম রাখিয়া, পাপকার্য্যের নামকরণ অধর্ম্ম করা হইয়াছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুইপ্রকার কর্ম্ম; তথাপি কর্ম্মী বলিতে অধর্ম্মকারী ব্যক্তিকে কেহই বুঝেন না; তদ্রূপ ধর্ম্ম বলিতেও অধর্ম্মের গ্রহণ করিতে হয় না; কিন্তু ধর্ম্মের ব্যাপক অর্থে শুভাশুভ কর্ম্মমাত্রই ধর্ম্মপদে বুঝিতে হয়।

অদৃষ্ট বা কর্ম্মফলের নামও ধর্ম্ম। মানব যে সকল ঐহিক কর্ম্ম করে, সে গুলির মধ্যে সকলগুলিই পারলৌকিক কর্ম্মফলের জনক নহে। পারলৌকিক শুভ-উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলই পরলোকে ভোগ হইয়া থাকে। জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ত আর কেহ পাথেয়ের মত উত্তরীয়ে বাঁধিয়া লইয়া যায় না; কাজেই ঐ কর্ম্মজন্য একটি অদৃষ্ট অনেকে মানিয়াছেন। ঐ অদৃষ্টই ধর্ম্ম। তবে পূর্ব্বোক্তমত দুরদৃষ্ট—ধর্ম্ম নহে,—অধর্ম্ম।

যাহা সৃষ্টির বিধারয়িতা, তাহাই ধর্ম্ম। জীবের উৎপত্তি না হইলে সৃষ্টিরক্ষা হয় না, কাজেই জীবোৎপত্তির সহায়তা করা মানবের ধর্ম্ম। পিতা জন্ম না দিলে, মাতা গর্ভে না ধরিলে সন্তান জন্মে না, কাজেই গর্ভধারণ মাতার, জন্মদান পিতার ধর্ম্ম।

উৎকৃষ্ট সন্তানোৎপত্তি, তাহাদের যথোচিত লালনপালন, শিক্ষার সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি পিতামাতার ধর্ম্ম। এই সকল কারণে ও অপরাপর কারণেও বিবাহ একটী ধর্ম্মকার্য্য। ঋতুমতীর সম্ভোগ পর্য্যন্ত ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত। বৃক্ষরোপণাদিও ধর্ম্মকার্য্য। মানব ও অপরাপর জীব ব্যতীত যাবৎ পদার্থের অস্তিত্ব ও রক্ষা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত। কতকগুলির উপকারিতা প্রত্যেক মানবই পাইয়া থাকেন, কতকগুলির উপকারিতা অপরাপর জীব পাইয়া থাকে; কতকগুলির কোন উপকারিতা কাহাকেও পাইতে দেখা যায় না, এইমাত্র। এই কারণে মানবের, অপর জীবের অস্তিত্ব রক্ষা প্রভৃতির সাক্ষাৎ বা পরম্পরা কারণ প্রভৃতিও ধর্ম্ম। বিবাহ হইতে বৃক্ষরোপণ, গৃহপ্রবেশ হইতে জলদান, সমস্তই ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত।

কতক ধর্ম্ম সর্ব্বমানবের, সর্ব্বজীবের উপকারক, তাহা পূর্ণ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। কতকগুলি কেবল মানবের উপকারক, তাহা সার্ব্বভৌমিক। কতকগুলি জাতিবিশেষের উপকারক, তাহা সাম্প্রদায়িক, কতকগুলি বা

পরিবার বিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের উপকারক সেগুলিও সাম্প্রদায়িক। সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্মের নাম সার্ব্বভৌমিক। বিশেষ ধর্ম্মের নাম সাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িক—পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া সঙ্কীর্ণ নহে। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম সকলেরই সমান উপকারক। সাম্প্রদায়িক—জাতিবিশেষের, বংশবিশেষের, পরিবার বিশেষের বিশেষ উপকারক। একই ব্যক্তি সার্ব্বভৌমিক ও সাম্প্রদায়িক—অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে পারেন। আমরা তাহাই করিয়া থাকি। সামান্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যথা—আতিথ্য, সত্য-পালন, অহিংসা, পরমেশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি। বিশেষ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান যথা—ব্রাহ্মণ-ভোজন, প্রতিমা-পূজা, দীক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি। সার্ব্বভৌমিক ব্রহ্মোপাসনার সহিত স্ব স্ব ইষ্টদেবতার উপাসনা, তাই উভয়ই আমাদের ধর্ম্ম।

মধ্যম ও অধম ব্যক্তি সমাজে অধিক আছে, অল্পশক্তি মানবই জগতে অধিক জন্মে। তাহাদিগের পক্ষে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অত্যন্ত দুরূহ। তদপেক্ষা সাম্প্রদায়িক সহজ। আমি বিশ্ববাসীর উপকারে অক্ষম বলিয়া কি গ্রামের উপকার করিব না, ব্যক্তিবিশেষের উপকার করিব না! সকলেই যদি স্ব স্ব পরিবার প্রতিপালনে মন না দিয়া বিশ্ববাসীর প্রতিপালনে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সে পালন সর্ব্বাঙ্গীন ফলপ্রদ হইতে পারে না। কোন কোন স্থলে সার্ব্বভৌমিক অপেক্ষা সাম্প্রদায়িকের মর্য্যাদা অধিক। যখন আমরা প্রিয়জনের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করি, সে সময়ে আমাদের দৃষ্টি প্রিয়জনের তাবৎ অঙ্গেই নিবদ্ধ থাকে, তবু বিশেষভাবে এক এক সময়ে এক একটি অঙ্গের উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। চৈতন্য সর্ব্বভূতে বিদ্যমান, তথাপি সেই চৈতন্যের আধার-বৈচিত্র্যে কখন কখন বিশেষ ব্যাপ্তি দেখা যায়। সার্ব্বভৌমিকের মধ্যে সাম্প্রদায়িকের মর্য্যাদা এই কারণে কোন কোন স্থলে অধিক। তবে সাধারণতঃ সার্ব্বভৌমিকই বড়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম সকল মানবেরই আদরের সামগ্রী। সাম্প্রদায়িকতা জাতি বিশেষের, দেশ বিশেষের অধিকতর আদরের বস্তু; পরিবার বিশেষের ও ব্যক্তি বিশেষের অধিকতম আদরের জিনিষ। উপযোগিতা দুয়েরই কম নহে। সার্ব্বভৌমিক ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মধ্যে প্রকৃত বিরোধ আমরা ত ইয়ত্তা করিতে পারি না।

নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যহেতু ধর্ম্ম,তদ্বিপরীত অধর্ম্ম। এই ঐশ্বর্য্য কোথাও ঐহিক, কোথাও বা পারলৌকিক। অধার্ম্মিকের জয় পরলোকে ত হয়ই না, ইহলোকেও হয় না। আপাততঃ শক্তিমান দুর্দ্দান্ত অধার্ম্মিকের নিন্দা লোকে সম্মুখে না করিতে পারে, অসাক্ষাতে করিবে না কেন? মৃত্যুর পরে তাহার নিন্দার আধারকে কে বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে, কত মহাপাপ ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মসী-কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

পরমাত্মার যাহা স্বরূপ, বিশ্বের যাহা মূল, জগতের যাহা পরাকাষ্ঠা, তাহা পরম ধর্ম্ম। আত্মজ্ঞান সাধারণতঃ ধর্ম্ম না হইলেও পরমধর্ম্ম।

আত্মজ্ঞান অবশ্য সার্ব্বভৌমিক, কিন্তু তাহার উপায় সকলের পক্ষে এক নহে। যথা জ্ঞান-যোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতি উপায় ব্যক্তিভেদে পৃথক পৃথক। যখনই পৃথক পৃথক তখনই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আসিল।

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে মনু সংহি-তার ব্রাহ্মণকুলোত্তম স্বয়ম্ভুব মনু বলেন—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়ঃ নিগ্রহ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥

এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। ধর্ম্ম লক্ষণকেও ধর্ম্মই বলে। এগুলি সকলের ধর্ম্ম, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। দম ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। অস্তেয় অচৌর্য্য। শৌচ বাহ্য ও আন্তরশুচিতা। ধর্ম্মের এক একটি অর্থও লক্ষণ।

অন্যতম সংহিতাকার যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

ইজ্যাচারদমাহিংসা দান্ স্বাধ্যায় কর্ম্ম চ।
অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনং॥

ইজ্যা—যজ্ঞ। যজ্ঞ—বিশেষ ধর্ম্ম, সাম্প্র-দায়িক ধর্ম্ম। যজ্ঞ সর্ব্বজাতির কর্ত্তব্য ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট নহে।

গঙ্গাস্নানাদি যাগযজ্ঞ এগুলি সাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িক বলিলেই সাধারণের চিত্তে একটী দলাদলির ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, ঐ ভাব সাম্প্রদায়িকতার কুফল। পুষ্করিণী মজিয়া গেলে তাহা হইতে দূষিত গন্ধ বাহির হয়, তাহাকে সরোবরের স্বাভাবিক গন্ধ বলা যায় না।

সার্ব্বভৌমিকের বা সাম্প্রদায়িকের আগন্তুক দোষ স্বাভাবিক নহে। মানবের চিত্তবৃত্তির দোষে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম কখন মৃত, সাম্প্রদায়িক কখন হিংসাপূর্ণ হইয়া উঠে। অনধিকারীর সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মালোচনার ফল আলস্য, জড়তা, উদাসীনতা প্রভৃতি। সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তির সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মালোচনার ফল দলাদলি, হিংসা, বিদ্রূপ, হত্যা পর্য্যন্ত। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম যেমন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ উপকারপ্রদ, অপকারের সময়েও অধিক অপ-কারক। এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে, আগামীবারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

আনন্দের ন্যাস।

ঘুমায়ে ছিলাম তাই জানি নাই নাথ,
তুমি এসে ব'সে আছ করি সুপ্রভাত;
সকল মালিন্য আজি ঘুচায়ে দিয়েছ,
সব শূন্য পুণ্য আবির্ভাবেতে ভরেছ;
বিরল-আলোকে মোর কুটীর উজ্জ্বল,
পরশমণির তেজে করে ঝলমল;
অঙ্গনে আছিল মোর শুষ্ক যে পাদপ,
সুপত্র কুসুমে তার ভরেছে বিটপ;
শুনি নাই যেথা কভু বিহঙ্গের রব,
সেথা পিক ডালে ডালে কলকণ্ঠ সব;
আমি নিঃস্ব দীনহীন, এ কি দীননাথ
বিশ্বভরা ধন দিলে হ'য়ে মুক্তহাত!
বিশ্বভরা এ রতন কোথায় রাখিব?—
বিশ্বেশ্বর দাও পদ, থুয়ে শান্ত হব।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র মিত্র।

গুপ্তেশ্বর।

আমি তখন মধ্য-ভারতের জব্বলপুরে। সে আজ এক বৎসরের কথা। এই চৈত্রমাস। এই নব-বসন্তের মধুর মলয়। শুক্লপক্ষের সুখ-ময় সময়ে যখন পূর্ণিমার চাঁদ ছাউনীর চারিদিকে প্রসারিত পাহাড়গুলির উপর অতি শুভ্র কিরণ বর্ষণ করিত—সে দৃশ্য অতি মধুর। প্রকৃতির বুক ধূ ধূ করিতেছে, চারিদিকের পাহাড়গুলি বিরাট-কায় মহাদৈত্যের মত গগনের নীলিমা চুম্বন করিতে উদ্যত। সেই ধূসরকায় ভূধরের শিরো-দেশে সুবিমল চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে, এ দৃশ্য অতি প্রাণস্পর্শী। জ্বালাময় জগতের শ্রান্ত ক্লান্ত জীব, সংসারে থাকিলে জ্বালা বই যাহার আর কোন কথা নাই, যাহাদের দেহ পীড়িত, চিত্ত শক্তিহীন, সেই সব লোক এখানে আসিলে একটা অনমুভবনীয়, অপ্রত্যাশিত শান্তি উপ-ভোগ করে।

রাত্রি তখন এগারটা বাজে। নগ্ন-প্রকৃতি সমুজ্জ্বল শশীকরোদ্ধত গলিত রজতধারা মাখিয়া অতি শোভাময়ী। আমরা অর্থাৎ আমি ও আমার প্রিয়তম দৌহিত্র শ্রীমান্ দেবকুমার চট্টোপাধ্যায়, আমরা দুই জনে বসিয়া প্রকৃতির এই মনোহর শোভা দেখিতেছি, আর নানাবিধ গল্প করি-তেছি, এমন সময়ে দেবকুমার সহসা সেই পাহাড়ের পশ্চিমোত্তর কোণের আর একটী পাহাড়ের চূড়া দেখাইয়া আমাকে বলিল—"দাদা মহাশয়! গুপ্তেশ্বরের মন্দির ঐ পাহাড়ে। আপনি গুপ্তেশ্বর দেখিয়াছেন কি?"

বালকের মুখ দিয়া এ উত্তেজনার প্রেরণা বোধ হয় মহাকালের ইচ্ছাতেই হইল। আমি বহুবার জব্বলপুরে গিয়াছি, নর্ম্মদা প্রপাত, গৌরীশঙ্কর, মর্ম্মর পাহাড়, সবই দেখিয়াছি, গৌরীঘাট, ভৃগুক্ষেত্র, দত্তাত্রের আশ্রম দেখি-তেও বাকী রাখি নাই কিন্তু এই গুপ্তেশ্বরের নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই। কেহ আমাকে ইতি-পূর্ব্বে বলেও নাই, যে আমাদের আবাস-স্থানের এক ক্রোশের মধ্যে—এক পাহাড়ের জঙ্গল-বেষ্টিত স্থানে—এই গুপ্তেশ্বরের মন্দির।

দেবকুমারকে বলিলাম—"না ভাই! গুপ্তে-শ্বর আমার দেখা হয় নাই। কথাটা মনে করিয়া দিয়া তুমি ভাল কাজই করিয়াছ। বিশেষতঃ "গুপ্তেশ্বর" যখন আমাদের এত কাছে, তখন তাঁহার শ্রীমন্দির দর্শনে বঞ্চিত থাকাটা বড়ই পরিতাপের কথা। চল, কালই আমরা তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া আসি।"

সেই পাষাণ-স্তূপের মধ্যে গভীর নিশীথে বসিয়া আমরা যে সঙ্কল্প করিলাম—তাহা পর-দিনেই কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলাম।

দেবকুমার বলিল—"আপনি এই চড়াই উৎরাইয়ের পথ হাঁটিতে পারিবেন না। এক-খানা সিগ্রাম ভাড়া করাই উচিত।

বালকের এ যুক্তি আমার চক্ষে বড় সমীচিন বলিয়া বোধ হইল। একখানি সিগ্রাম ডাকা-ইয়া, একজন চাকরকে সঙ্গে লইয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম।

বেলা তিনটার সময় আমরা যাত্রা করি। তখন রৌদ্রের খুব তেজ। দেবকুমার বলিল—"গুপ্তেশ্বরের মন্দির পাহাড়ের বক্ষ ভেদ করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। সে মন্দির অতি জনশূন্য।

কেবল সেবায়েত পুরোহিত ও দুই একজন সাধু-সন্ন্যাসী ভিন্ন আর কেহই সেখানে থাকে না। সুতরাং এই পাহাড় ও জঙ্গল-বেষ্টিত স্থানে একটু বেলাবেলি যাওয়াই উচিত। তাহা হইলে বেলা থাকিতে থাকিতে ফিরিতে পারিব।”

মন্দিরে পৌঁছিতে একঘণ্টা সময় লাগিল। আমরা কয়েকটী সেনা-নিবাসের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া, গুপ্তেশ্বরের পাহাড়ের কাছে উপনীত হইলাম। সিগ্রাম চলিবার পথ বড় সুগম বলিয়া বোধ হইল না। আমি গাড়ীওয়ালাকে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দেবকুমারকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে পাহাড়ের উপত্যকা দিয়া চলিতে লাগিলাম।

দুই দিকের দৃশ্য অতি নয়নরঞ্জন। কৃষ্ণকায় অতিকায় হস্তীর মত, পাথরের বড় বড় স্তূপ চারিদিকে। একটী ছোট, তারপর একটী মাঝারি, তারপর একটী খুব বড়। পাথরগুলি খুব কালো। কোন কোনটী একতলার সমান উঁচু, কোনটী বা উচ্চে দুতলার মত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সেগুলি যেন কে যত্ন করিয়া সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র তৃণক্ষেত্র। কোথাও বা ঝোপের মত একটা স্থান। আবার কোন স্থান বা একেবারে শূন্য। সেখানে কেবল উপল খণ্ড।

আমরা প্রায় এইভাবে কৃষ্ণকায় উপত্যকার মধ্য দিয়া আধক্রোশ পথ অতিক্রম করিলাম। পথে জনমানবের সঙ্গে দেখা হইল না। ভয় হইতে লাগিল—সহসা যদি কোন বন্যজন্তু, অর্থাৎ বরাহ ইত্যাদি বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাদের নিরাপদ আশ্রয় স্থান পর্য্যন্ত নাই।

যাহা হউক, আমরা গুপ্তেশ্বরের দর্শনাশায় প্রফুল্ল-চিত্তে, উদ্যমের সহিত সেই পথটা অতিক্রম করিলাম। ক্রমশঃ মন্দির-চূড়া, তৎপরে মন্দির-চত্বর দেখা দিল।

মন্দিরটী পাহাড়ের এক উচ্চ সমতলে নির্ম্মিত। ঠিক নির্ম্মিত বলিতে পারি না, কারণ প্রকৃত মন্দির, পর্ব্বতের একটী স্বাভাবিক গুহা বই আর কিছুই নয়। এই গুহার মধ্যে সার্দ্ধেক হস্ত প্রমাণ শিবলিঙ্গ বিরাজমান। ইনিই গুপ্তেশ্বর মহাদেব।

যেখানে গুহাটী শেষ হইয়াছে, সেই স্থান হইতেই মানুষের কারুকার্য্যের সূচনা। অর্থাৎ এই গুহার সম্মুখ হইতে সমচতুষ্কোণ আকারে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত চত্বর। চত্বরের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র “নাটমন্দির”। এই নাটমন্দিরের আশে পাশে দালান বা বারান্দা। বারান্দার এক কোণে নিত্যপূজক পুরোহিতের বাসস্থান।

এই পুরোহিত ব্যতীত আর কোন লোক এখানে থাকেন না। পুরোহিত ঠাকুরকে সেই মন্দিরের নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও আমরা দেখিতে পাইলাম না। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়, এমন কোন ব্যক্তিই সেখানে নাই। কেবলমাত্র বাহিরের চত্বরে, এক ভস্মাচ্ছাদিত রুদ্রাক্ষমণ্ডিত সন্ন্যাসী ধূনী জ্বালাইয়া স্তিমিত-নেত্রে অজিনাসনে বসিয়া আছেন।

সন্ন্যাসীঠাকুর কাহারও সহিত কথা কহেন না। তিনি আমাদিগকে প্রণত হইতে দেখিয়া দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আর সেই হস্তটীর সহায়তায় আমাদের সে মন্দিরের বাহিরের দিকটী দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে আমরা তাঁহার মনের কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তিনি আমাদের চলিয়া যাইতে বলিলেন—কি আর কিছু আদেশ করিলেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, পাছে আমরা কোনরূপে তাঁহার বিরক্তির কারণ হই, এই ভাবিয়া গুপ্তেশ্বরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মন্দির-চত্বর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

নিম্ন সমতলে দুইটী কূপ আছে। কূপ দুইটী পাশাপাশি অবস্থিত। একটীর নাম শিবগঙ্গা। অপরটী দুধগঙ্গা। প্রকৃতিদেবীর কেমন এক অদ্ভুত লীলা, এ স্থানের কি এক মাহাত্ম্য, যে এই দুইটী পবিত্র কূপ পাশাপাশি অবস্থিত হইলেও, তাহার একটীর জল (অর্থাৎ দুধগঙ্গার) দুধের মত সাদা। অপরটী মিশ-কালো। একই স্থানে জলের মধ্যে এই প্রকার পার্থক্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম।

তখন বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে। পশ্চিম-প্রদেশের অনেক সাধারণ ব্যবহার্য্য ইঁদারাতে এক কাষ্টদণ্ড সংলগ্ন জল তুলিবার পাত্র থাকে। দুধ-গঙ্গা ও শিবগঙ্গা উভয়ের উপরই সেইরূপ এক একটী ক্ষুদ্র লৌহপাত্র দড়ির সঙ্গে বাঁধা আছে। কূপমধ্যস্থ জলের গভীরতা বেশী নহে—বোধ হয় তাহার চারিপাশের পাড় হইতে আট দশ হাত নিম্নে।

আমরা এই পাত্র সহায়তায় দুধগঙ্গার জলে, মুখ-হাত ধুইয়া ও পান করিয়া অনেকটা শ্রান্তি দূর করিলাম।

সহসা আমাদের সম্মুখে এক দীর্ঘকায় পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিলাম,—"আপনি কি গুপ্তেশ্বরের পুরোহিত?"

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন,—"হাঁ, আমিই বাবার নিত্য সেবা করি।"

আমি। আপনি কি এই মন্দির মধ্যে থাকেন?

পুরোহিত। হাঁ বাবুসাহেব!

আমি। এখানে কোন অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন সাধু সন্ন্যাসী আসেন কি?

পুরোহিত। বাবার কাছে না আসেন কে? তবে যাহারা সিদ্ধ পুরুষ, তাহারা জঙ্গলের মধ্যে থাকেন। সহসা কাহাকেও দেখা দেন না।

আমি। এ গুপ্তেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করিল কে?

পুরোহিত। তা ঠিক জানি না। তবে শুনিয়াছি, রাণী দুর্গাবতী এই মহাদেবের পূজা করিতে এখানে আসিতেন। এই উপত্যকা ও পাহাড়ের পর যে মাঠ দেখিতেছেন, সেই মাঠ পার হইলেই রাণী দুর্গাবতীর মদন-মহল।

আমি। বাবার নিত্যসেবার আয় কিরূপ?

পুরোহিত। একজন মারোয়ারি এই চত্বর ও লাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আর আশে পাশে যে সব বাগান দেখিতেছেন এই সব আম বাগানের ফল ও কাঠ বিক্রয় করিয়া বাবার নিত্যসেবা চলে। তাহা ছাড়া উক্ত মারোয়ারি সাধু, বাবার মন্দিরে সাধু সন্ন্যাসীর খরচের জন্য সদাব্রত হিসাবে মাসিক সাহায্যও করিয়া থাকেন। আপনাদের নিবাস কোথা বাবু সাহেব?"

আমি। উপস্থিত এই জব্বলপুরে। কিন্তু আমাদের নিবাস কলিকাতায়।

পুরোহিত। কলিকাতা! বাঙ্গালা মুলুকে ত। কলিকাতার নামই শুনিয়াছি, জীবনে কখনও দেখি নাই।

আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে একজন পাহাড়ী ভৃত্য একটা ধামা কাঁচা আম আনিয়া সেই পুরোহিত ঠাকুরের কাছে রাখিল। পুরোহিত ঠাকুর তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া আট দশটী বড় বড় আম লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন—ইহাই বাবার প্রসাদ। আমার এখানে এমন কোন মিষ্টান্ন ভোগ নাই, যাহা আপনাকে দিতে পারি।

পুরোহিত ঠাকুর কোন মতেই ছাড়িলেন না দেখিয়া অগত্যা সেই দেবপ্রসাদ আমাদের অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইল।

আমি একটী টাকা লইয়া পুরোহিত ঠাকুরকে দিতে গেলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে যেন বড়ই বিরক্ত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"বাবুজি! টাকায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। সাধু সন্ন্যাসীর সদাব্রতের খরচ সেই মারোয়ারি দিয়া থাকেন। আপনি ঐ টাকাটী কোন গরীব লোককে দিবেন।"

আমরা পুরোহিতের সেই ভৃত্যকে চারি আনা পয়সা দিলাম। সে তাহাতে ভারি খুসী। অপরাহ্ন উপস্থিত দেখিয়া আমরা সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

রাজা নীলাম্বর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

দেবদাস অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিল, তারপর স্নান করিয়া পূজা-আহ্নিকে নিযুক্ত হইল। এই ধর্ম্মভাব দেখিয়া শীতলাকান্ত রায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মন্ত্রী-পুত্রের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি দৃঢ় হইল। আহ্নিক শেষ হইলে জলযোগের ব্যবস্থা হইল। জলযোগের পর একটী কক্ষে বসিয়া দেবদাস দুর্গাধ্যক্ষের সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হইল। দেবদাস বলিল—"এই দুর্গ বেশ সুরক্ষিত, শত্রুর সাধ্য কি আক্রমণ করে। কিন্তু আজ কাল মুসলমানেরা যেরূপ সুচতুর ও বলবান, বলা যায় না—কি হয়। আপনি খুব সাবধানে থাকবেন। কাহাকেও বিশ্বাস করবেন না, আজ-কাল প্রায় সকল লোকই বিশ্বাসঘাতক। আপনি বৃদ্ধ এই সব সৈন্য বিশ্বাসী ত?" দুর্গরক্ষক বলিলেন—"হাঁ। সে বিষয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না। যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন সহজে এ দুর্গ হাত-ছাড়া হবে না।"

দেব। বড় সন্তুষ্ট হ'লেম, আপনার কথা আমি পিতাকে বলবো ও রাজা ফিরে এলে তাঁকেও জানাবো।

দুর্গ। ঈশ্বর করুন রাজার যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

দেব। আমরা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট তাঁর মঙ্গল কামনা করি।

দুর্গ। আপনার পিতা পুরাতন [illegible]

আমাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা রাজ্যের ও রাজার মঙ্গল কামনা করা।

দেব। আপনি একবার রাজবাটী যাবেন বল্‌ছিলেন ?

দুর্গ। একবার যাওয়া কর্ত্তব্য, তবে এই গোলযোগের সময় কাকেই বা রেখে যাই।

দেব। আপনার সহকারী কেহ নাই ?

দুর্গ। সহকারীও বৃদ্ধ, বিশ্বাস ক'রে যাওয়া যায় না।

দেব। যদি বলেন তবে আমি দুই চারি দিনের জন্য থাক্‌তে পারি, আপনি একবার রাজধানী থেকে আসুন।

শীতলাকান্ত রায় এই প্রস্তাবে দেবদাসের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—"বিনা হুকুমে দুর্গ ত্যাগ করতে পারি না।"

দেব। আজকাল ত রাজা উপস্থিত নাই, মন্ত্রী রাজ্য চালাচ্ছেন, তিনি অনুমতি দিলে চল্‌বে ত ?"

দুর্গ। মন্ত্রী মহাশয়ের আদেশই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

দেব। তবে আপনি এক কাজ করুন, একখানি পত্র লিখিয়া আমার পিতার নিকট লোক পাঠান, আমিও সেই সঙ্গে পত্র দিব। সেখান থেকে হুকুম এলেই আপনি যেতে পার্‌বেন। অনেক কাল রাজধানী যান নাই, আমার পিতাও বল্‌ছিলেন, তাঁর বাল্যবন্ধু শীতলাকান্ত রায়কে অনেক দিন দেখেন নাই।

অতিশয় বৃদ্ধ দুর্গাধ্যক্ষ দেবদাসের এত আগ্রহে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তিনি বলিলেন—"ভালই, আগামী কল্যই পত্র পাঠাবো।"

ইহার পর আর কোন কথা হইল না।

এইভাবে সে দিবস গত হইল, তৎপর দিবস দুর্গাধ্যক্ষ মন্ত্রীর নামে পত্র লিখিয়া একজন লোক রাজধানী প্রেরণ করিলেন, দেবদাস সেই সঙ্গে একখানি পত্র পিতার নিকট পাঠাইল।

সে দিবসও এইভাবে গত হইল, দেবদাসের আহারের যথেষ্ট আয়োজন হইল, সরসীবালা পরিবেশন করিল। দেবদাসের ভাব দেখিয়া সরসীবালা তাহার নিকটে আসিতে কেমন দ্বিধা বোধ করিতে লাগিল, তথাপি পিতার আদেশে তাহাকে আসিতে হইল।

রাত্রি প্রভাত হইল, বিহঙ্গমেরা মনের আনন্দে গান করিতে করিতে স্ব স্ব কুলায় পরিত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে বাহির হইল। প্রাতঃ-সমীরণ বড় মিষ্ট, জীবকুলকে সচেতন করিয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিল। দুর্গের নহবৎ বাজিয়া উঠিল, সানাইর ললিত রাগিণী প্রাণ মাতাইল। বাহির ফটকের প্রহরী বদলি হওয়াতে আর একজন নূতন প্রহরী তাহার স্থান অধিকার করিল। দুর্গাধ্যক্ষ উঠিয়া ভগবানের নাম করিয়া বাহিরে আসিলেন দেবদাসের অদ্য শয্যা হইতে উঠিতে বিলম্ব হইল, সে 'দুর্গা' নাম স্মরণ করিয়া উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিল, তারপর স্নানের জোগাড় করিতে গেল। এই সময়ে দুর্গের বাহিরে কোলাহল উত্থিত হইল, সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই দিকে ছুটিল। কেহ কেহ মনে করিল, শত্রু আক্রমণ করিয়াছে, কেহ কেহ ভাবিল, দুর্গের সৈন্যেরা গোলমাল করিতেছে। দুর্গাধ্যক্ষ ও দেবদাস

উভয়ে তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিলেন। দেখিতে দেখিতে কতিপয় রাজ-সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিল, হংসেশ্বর রায় ইহাদের দলপতি। হংসেশ্বর পূর্ব্বে এ দুর্গে অতিথি হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়া দুর্গাধ্যক্ষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। হংসেশ্বর একখানি হুকুমপত্র দুর্গাধ্যক্ষের হস্তে দিলেন, তাহাতে স্বয়ং রাজার দস্তখত ও মোহরাঙ্কিত। দুর্গাধ্যক্ষ সসম্মানে হুকুমপত্র গ্রহণ করিলেন ও পাঠ করিয়া দেবদাসের দিকে দৃষ্টি করিলেন। হংসেশ্বর সঙ্গীয় সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা দেবদাসকে তৎক্ষণাৎ বন্দী করিল। দেবদাসের মুখ শুষ্ক হইল, তথাপি সাহসের সহিত বলিল—"আমাকে কে আবদ্ধ কচ্ছে? কার হুকুম?" হংসেশ্বর বলিলেন—"স্বয়ং রাজাধিরাজ নীলাম্বরের।" এই কথা শুনিয়াই দেবদাসের আত্মা শুকাইল। আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

শীতলাকান্ত রায় বলিলেন—"রাজা কি রাজধানী আগমন করেছেন?" হংসেশ্বর বলিলেন—"ভগবানের কৃপায় তিনি রাজ্যে প্রত্যাগমন করেছেন।" পুনরায় দুর্গাধ্যক্ষ বলিলেন—"ইনি কি অপরাধে অপরাধী?" হংসেশ্বর উত্তর করিলেন—"সে কথা পরে জান্‌তে পার্‌বেন।" দুর্গাধ্যক্ষ বলিলেন—"আপনি কি আর একজন লোকের সঙ্গে অল্প দিন হইল, এই দুর্গে অতিথি হ'য়েছিলেন?" এবার হংসেশ্বর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তারপর উত্তর করিলেন—"হাঁ, আমরা অতিথি হ'য়েছিলেম।" দুর্গাধ্যক্ষ বলিলেন—"আপনার সঙ্গীয় লোকটি কে? তিনিও কি একজন রাজ-সৈনিক?" এবার হংসেশ্বর হাসিয়া উঠিলেন, তারপর বলিলেন—"সে বিষয় পরে জান্‌তে পার্‌বেন। ইহার পর আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। দুর্গাধ্যক্ষ বলিলেন—"আপনারা আহার করবেন ত?" হংসেশ্বর স্বীকৃত হইলেন, তিনি মনে করিলেন—আবার সরসীবালার দর্শন পাইবেন। বন্দীকে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া একঘরে রাখা হইল, তথায় আহার্য্য দেওয়া হইল। হংসেশ্বর রায় ও দুর্গাধ্যক্ষ এক কক্ষে আহারে বলিলেন, সরসীবালা পরিবেশন করিল। আবার সেই অতিথিকে দেখিয়া সরসীবালার হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। সে শুনিতে পাইল, ইনি একজন রাজকর্ম্মচারী। আহারান্তে আর তিনি বিশ্রাম করিলেন না, দুর্গাধ্যক্ষের নিকট বিদায় লইয়া বন্দীকে লইয়া রওনা হইলেন, যাওয়ার সময় দুর্গরক্ষার জন্য বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন। সরসীবালা বাতায়নে দাঁড়াইয়া যতক্ষণ এই অশ্বারোহীকে দেখা গেল—ততক্ষণ দেখিল।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিচার।

অদ্য দেবদাসের বিচার স্বয়ং রাজা করিবেন অতএব লোকে লোকারণ্য। মন্ত্রী ও সভাসদেরা যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়াছেন, রাজা এখনও আসেন নাই। আসামী মন্ত্রী-পুত্র প্রহরীদের হেপাজতে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান। রাজসভা অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত, সুবর্ণ-খচিত চন্দ্রাতপ রৌপ-দণ্ডের উপর শোভা পাইতেছে,

তাহার নীচে হস্তী-দন্তের সুসজ্জিত সিংহাসন। দর্শকগণ সভার অদূরে দণ্ডায়মান, কেহ বা উপবিষ্ট। হঠাৎ নকীব চীৎকার করিয়া উঠিল, রাজা সভায় প্রবেশ করিলেন, সভাসদগণ সকলেই দণ্ডায়মান হইল। রাজা নীলাম্বর সিংহাসনে উপবেশন করিলে সকলেই উপবেশন করিলেন।

দেবদাসের বিচার আরম্ভ হইল। আসামীকে ঐ অবস্থায় নিকটে আনিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"মন্ত্রী-পুত্র! কিসের জন্য তোমাকে আনা হ'য়েছে জান?"

দেব। জানি না।

রাজা। কোন দুষ্কর্ম্ম করেছ?

দেব। না।

রাজা। আমি সব জানি, এখনও অপরাধ স্বীকার কর, ভগবানের নিকট মুক্ত হবে।

দেব। আমি ভগবান জানি না, আমি কোন অপরাধ করি নাই।

রাজা। তোমার বিশ্বাস, তোমার অপরাধের বিষয় কেহ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব প্রকাশ হয়েছে।

দেব। আমি কি অন্যায় করেছি? নিরপরাধে আমার শাস্তি কেন?

রাজা সভাসদদিগের প্রতি তাকাইলেন, মন্ত্রীকে বলিলেন—"আপনি বহুকালের চাকর, আপনার পুত্রের বিচার হচ্ছে, আমি আপনাদের সকলকে এই বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত কর্‌লেম। আপনারাই ইহার বিচার করুন।"

একজন সভাসদ বলিলেন—আপনি রাজা, স্বয়ং বিচার করুন। দেবদাস কি অপরাধ করেছে আমরা কেহই জানি না। আপনি বিচার করুন. আমরা মতামত দিব।" রাজা এই কথায় সন্তুষ্ট হইলেন। রাজা পুনরায় বলিলেন—"দেবদাস! কামরূপের ঘটনা স্মরণ কর। যখন কামরূপের রাজার সঙ্গে আমার যুদ্ধ বাধে, তখন তুমি বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করেছ।" দেবদাস চমকিত হইয়া রাজার দিকে দৃষ্টি করিল। এ সংবাদ রাজা কি ভাবে পাইলেন? পুনরায় রাজা বলিলেন—সে কথা কি অস্বীকার কচ্ছ? আমাদের গুপ্তকথা সব সেস্থানে প্রকাশ ক'রে দিয়েছ। তোমার এরূপ দণ্ডই যথেষ্ট নহে।" দেবদাস বলিল—"ইহার প্রমাণ কি?" রাজা বলিলেন—"ইহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। তারপর আমার অন্তঃপুরে কি পরামর্শ করেছ? সেই পরামর্শের ফলে মৃগয়ার দিন আমাকে বধ করার জন্য তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহারও প্রমাণ আছে। তারপর এই রাজ্য নিজে গ্রহণ কর্‌তে সচেষ্ট ছিলে। মুসলমানদিগকে আমার বিপক্ষে উত্তেজিত করেছ। আমার ঘোড়াঘাট দুর্গের অধ্যক্ষকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করেছিলে। তোমার দণ্ড অসীম।" দেবদাস এই সব কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল, সে বুঝিল এবার তাহার অব্যাহতি নাই। তথাপি সে সাহসের সহিত বলিল—"সব মিথ্যাকথা।" রাজা বলিলেন—"তোমার মনে আছে যেদিন অন্তঃপুরের উদ্যানে তোমরা পরামর্শ কর, সেই দিন কে প্রাচীরের নিকট "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল।" দেবদাসের সে কথা স্মরণ হইল, সে চুপ করিয়া থাকিল। রাজা বলি-

লেন--"সভাসদগণ! মন্ত্রী মহাশয়! আপনারা এই সব বিষয় ভালরূপে বিবেচনা করুন। রাজার কার্য্য বিচার করা, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে মর্ত্তাধামে অবস্থিত। যে রাজা উপযুক্ত বিচার না করে সে নরকে যায়। রাজার পক্ষপাতি হওয়া কর্ত্তব্য নয়। আপনাদের সকলের মতামত আমি চাই। আমি নিজে দেবদাসের সকল কার্য্য জানি,মনে করেছিলেম মাপ কর্‌বো, তারপর দেখি আমার প্রাণের দিকে উহার লক্ষ্য। আমি উহার পিতাকে ও ওকে প্রতিপালন কচ্ছি, কখনও ইষ্ট বই অনিষ্ট করি নাই। আমার উপকারের পরিবর্তে অপকারের চেষ্টা, উদ্দেশ্য রাজ্য লাভ। কলিযুগে সকলই সম্ভবে। আমি এখন সাক্ষী উপস্থিত কচ্ছি। আপনারা দেখুন অপরাধীর কি দণ্ড হওয়া উচিত।" দেবদাস সব কথা শুনিল, তাহার হৃদয়ে ভয় জন্মিল, সে তাহার পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। একবার যবনিকার অন্তরালে তাকাইল, দেখিল দুটি চক্ষু তাহার দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহার মাথা ঘুরিল। সে বলিল—"রাজন্! আমি দেখ্‌ছি আমার নিস্তার নাই, পাপের ফল হাতে হাতে ফলে। আমাকে যে শাস্তি ইচ্ছা দিন. আমি সব অপরাধ স্বীকার কচ্ছি,আর সাক্ষীর দরকার নাই।"

সভাসদ্‌গণ সকলেই চমকিত হইল,মন্ত্রী বিমর্ষ হইয়া একবার উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলেন। রাজা বলিলেন—"আমি ছদ্মবেশে ইহার কার্য্য দেখেছি। যা হ'ক্, যখন আসামী অপরাধ স্বীকার কচ্ছে, তখন আর সাক্ষীর প্রয়োজন নাই। আপনাদের মতামত কি জানাইবেন।"

সভাসদ্‌গণ সকলে এক সঙ্গে পরামর্শ করিলেন, তারপর সকলে বলিলেন—"এই সব অপরাধের অন্য দণ্ড নাই, প্রাণদণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য।" দর্শকগণ চমকিয়া উঠিল, মন্ত্রী অচেতন হইলেন।

রাজা জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন—"দেবদাস! তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।" তৎক্ষণাৎ প্রহরীরা আসামীকে কারাগারে লইয়া গেল, সভাভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবদাসের পরিণাম।

রজনী তৃতীয় প্রহর, সুমিষ্ট মৃদু মৃদু বাতাস বাতায়ন দিয়া রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেছে। অত্য ভয়ানক গ্রীষ্ম, সমস্ত দ্বার ও গবাক্ষ খুলিয়া রাজা ও রাণী শয়ন করিয়াছেন। গৃহের অভ্যন্তরে একটী বৃহৎ আলো জ্বলিতেছে। সুমিষ্ট বেল ও যুঁই ফুলের গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করিতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি দেখিলেন তাঁহার গুরুদেব মস্তকের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সন্ন্যাসীর অনুগমন করিলেন, রাণী অঘোর নিদ্রায় অভিভূতা থাকিলেন।

একটী গুপ্ত সিঁড়ি দিয়া উভয়ে রাজ অন্তঃপুরের উদ্যানে নামিলেন, তারপর একটী নির্জ্জন স্থানে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আজ বেশ সুবিচার করেছ, দেবদাসের উপযুক্ত দণ্ড হ'য়েছে। ইহাতে কাহারও কিছু বল্‌বার নাই। কিন্তু হিন্দু রাজার রাজত্বে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড

শুভজনক নহে, তোমার অমঙ্গল ঘট্‌তে পারে। আমার এক অনুরোধ রাখ্‌তে হবে।" রাজা জোড় হস্তে বলিলেন,—"প্রভুর যেরূপ আদেশ বলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন—"এই বালককে আমায় ভিক্ষা দেও।" রাজা বলিলেন—"আপনি ইচ্ছা কর্‌লেই হ'ল, ইহাতে আবার আমার অনুমতির আবশ্যক কি?" গুরুদেব বলিলেন—"অদ্য রাত্রেই আমি তাকে লইব, তুমি আমার সঙ্গে কারাগারে এস।" সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে চলিলেন, রাজা ভৃত্যের ন্যায় পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। উদ্যানের এক স্থানে একটী ক্ষুদ্র গুপ্ত দ্বার ছিল। তাহা খুলিয়া উভয়ে চলিলেন। ক্রমে কারাগারের নিকট উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"তুমি প্রহরীদের নিকট যাও।"

দুইজন প্রহরী সশস্ত্র প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, রাজা যাইতেই একজন বলিল—"কে তুমি?" রাজা নিজ মস্তক একখানি বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিলেন, তারপর নিঃশব্দে প্রহরীকে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখাইলেন। প্রহরী সসম্ভ্রমে দ্বার ছাড়িয়া দিল। রাজা ভিতরে প্রবেশ করিলেন, সন্ন্যাসী বাহিরেই দণ্ডায়মান থাকিলেন। রাজা ভিতরে দেখিলেন—অপর একজন উচ্চ প্রহরী দণ্ডায়মান, তিনি মস্তকের কাপড় খুলিলেন, সে দেখিল স্বয়ং রাজা উপস্থিত, অমনি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। রাজা বলিলেন—"বলরাম! দেবদাসের নিকট নিয়ে চল।" সে অমনি অগ্রে অগ্রে চলিল, রাজা সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

একটী ক্ষুদ্র কক্ষে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দেবদাস মৃত্তিকায় পতিত আছে, সে নিজের পাপের বিষয় ভাবিতেছে। এমন সময়ে ঝন্ ঝন্ শব্দে লৌহদ্বার খুলিয়া গেল, দেবদাস দেখিল এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিতেছে। রাজা বলিলেন—"দেবদাস, আমার সঙ্গে এস।" দেবদাস দেখিল স্বয়ং রাজা, সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল, মনে করিল বোধ হয় অদ্য রাত্রেই তাহার জীবনলীলার শেষ হইবে। সে আর আপত্তি না করিয়া উঠিল, কিন্তু লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকাতে অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজা ডাকিলেন—"বলরাম।" বলরাম চাবি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং রাজার ইঙ্গিতে শৃঙ্খল খুলিয়া দিল। তখন রাজা দেবদাসকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। বলরামকে বলিলেন "আসামীকে আমি স্বয়ং নিলেম। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌লে কিছু বলো না।" বলরাম কোন কথা বলিল না, সেলাম করিল মাত্র। রাজা দেবদাসকে লইয়া কারাগার হইতে বাহির হওয়া মাত্র বাহিরের প্রহরীদ্বয় বলিল "অন্য লোক সঙ্গে নেওয়ার হুকুম নাই।" রাজা তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, তাহারা দেখিল স্বয়ং রাজা নীলাম্বর। অমনি অভিবাদন করিল, আর কোন কথা বলিল না। রাজা দেবদাসকে লইয়া সন্ন্যাসীর নিকট গেলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—"দেবদাস তুমি ভয়ানক অপকর্ম্ম করেছ, ইহার প্রায়শ্চিত্ত এক ঈশ্বরের নিকট। তোমার প্রাণদণ্ড হ'য়েছে, তোমার যথার্থই প্রাণদণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য। প্রাণদণ্ড দুই প্রকার। আত্মার বিনাশ নাই, দেহের বিনাশ হয়। তুমি এখন ঈশ্বরে সমর্পিত

হ'লে, অতএব সংসার হইতে চিরবিদায় লও, এই এক প্রকার প্রাণদণ্ড। ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ করলেই তোমার মুক্তি হবে। আমার সঙ্গে এস। নীলাম্বর! তুমি বাড়ী যাও, তোমার বিপদ সম্মুখীন, সে সময় আমি উপস্থিত থাকবো। কোন ভয় করবে না, ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী দেবদাসকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। রাজা কতকক্ষণ সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিলেন, তারপর গুপ্ত দ্বার দিয়া উপরে আসিলেন, দেখিলেন রাণী তখনও নিদ্রায় অচেতন। কিন্তু আর একজন তাঁহার আগমন লক্ষ্য করিয়াছিল, সে ভুবনেশ্বরী।

পর দিবস সকলে শুনিল—দেবদাস কারাগার হইতে কোথায় গিয়াছে। প্রহরীরা পরস্পর নানারূপ ইশারায় কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। সকলেই স্থির করিল—গোপনে রাজাজ্ঞায় তাহাকে নিহত করা হইয়াছে। মন্ত্রীও তাহাই শুনিলেন, অতএব পুত্রশোকে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন, তাঁহার প্রতিহিংসা বলবতী হইল। কি ভাবে যে দেবদাসকে বধ করা হইল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জন্মোৎসব।

এই ঘটনার এক দিন পরেই রাজবাটীতে রাজার জন্মোৎসব, সমস্ত সভাসদ্‌গণও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির রাজবাড়ী ভোজনের নিমন্ত্রণ। রাজা স্বয়ং আহারের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। এবার আয়োজন কিছু বেশী—কারণ রাজা নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অন্তঃপুরে রাণী ও ভুবনেশ্বরী স্ত্রীলোকদের ভোজনের বন্দোবস্ত করিতেছেন। চারিদিকে আমোদ। নানারূপ বাদ্য-নহবৎ বাজিতেছে। অরণ্য হইতে মৃগ বধ করিয়া আনা হইয়াছে, সেই মাংস অভ্যাগতদিগকে দেওয়া হইবে। মন্ত্রী মহাশয় পুত্রশোকে অস্থির ছিলেন, কিন্তু অদ্য আর রাজবাটী না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনিও আহারে বসিলেন। ভুবনেশ্বরী অন্তঃপুরে রাণীকে বলিলেন—"আপনি স্বয়ং সকলের ভোজন পর্য্যবেক্ষণ করুন, আমি একবার বাহিরের খাওয়ার আয়োজনটা দেখিয়া আসি।" ভুবনেশ্বরী বাহিরে চলিয়া গেল, এবং যবনিকার অন্তরাল হইতে সব দেখিতে লাগিল।

রাজধানীর স্থানে স্থানে এই উপলক্ষে নৃত্য গীত হইতে লাগিল, প্রজারা মনের আনন্দে আজ বেড়াইতে লাগিল; কেহ বা আমোদ করিতে লাগিল, কেহ বা আমোদ দেখিতে লাগিল। চারিদিকে সকলেই হর্ষোৎফুল্ল। রাজা নীলাম্বর সকলেরই প্রিয়পাত্র, তিনি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে প্রজারা বড় আনন্দিত। কেহ কেহ বা কালী বাড়ী পূজার বরাদ্দ করিতেছে, কেহ বা লক্ষ্মীনারায়ণজীর নিকট ভোগ দিতেছে।

বালকেরা একত্র সমবেত হইয়া নৃত্য করিতেছে, কেহ বা রাধাকৃষ্ণ সাজিতেছে, কেহ বা পঞ্চ পাণ্ডবের বেশে কৌরবদের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে, বৃদ্ধেরা দাঁড়াইয়া এই সব

তামাসা দেখিতেছে। স্ত্রীলোকদেরও আজ মনে বড় আনন্দ, তাহারা রাশি রাশি ফুল সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথিতেছে। রাজা যখন অপরাহ্নে ভ্রমণে বাহির হইবেন, তখন গবাক্ষ হইতে ফুলের মালা তাঁহার উপর বর্ষণ করিবে। আর যে সব যুবকেরা কৃত্রিম যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে যে জয়শালী হইবে, তাহাকে ফুলের মালা দিবে, এই আশা অনেকে করিতেছেন।

রাজবাটীর সম্মুখে যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছে, রাজ সৈনিকগণ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারভুক্ত যুবকগণ এই স্থানে যুদ্ধের পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইযাছে। হংসেশ্বর রায় এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্ত লক্ষ্য করিতেছেন ও পরীক্ষার্থীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছেন। এক দিকে তীরন্দাজদিগকে রাখা হইল, আর এক দিকে অসিধারিদিগকে, তাহার বিপরীত দিকে বর্শাধারীদিগকে, ও উহারই নিকটে মল্লযোদ্ধাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান করান হইল। এমন সময়ে প্রজাবৎসল রাজা আসিযা একটী সিংহাসনে বসিলেন, সকলেই আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল। সভাসদেরা নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মন্ত্রী এই আনন্দে যোগদান করিলেন না,তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একখানি পত্র রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজা নীলাম্বর লিপি পাঠ করিয়া একটু মৃদু হাসিলেন, অন্য কোন কথা বলিলেন না।

প্রথমতঃ অসিধারীদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সকলে এক স্থানে সমবেত হইল। রাজা ইঙ্গিত করা মাত্র শঙ্খধ্বনি হইল, অমনি দুইজন করিয়া লোক রণপ্রাঙ্গনে নামিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সকলে দেখিল যুদ্ধার্থীগণ প্রাণপণে যুদ্ধ আরম্ভ করিযাছে। এক ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল,সে একজন রাজসৈনিক। সকলে তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। তারপর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল, ভীমসিংহ নামক একজন নাগরিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল। তারপর তীরের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। দূরে কতকগুলি বৃক্ষ ছিল, একটী বৃক্ষে মোমের পক্ষী বাঁধা হইল, তাহার চক্ষু দুটী লোহিত বর্ণ ও অতি ক্ষুদ্র। ঐ পক্ষীর বাম চক্ষু বিদ্ধ করিতে হইবে। তীরন্দাজগণ দূরে এক স্থানে দাঁড়াইল। ইঙ্গিত করা মাত্র প্রথম ব্যক্তি লক্ষ্য করিয়া তীর ছাড়িল, পাখীর নিকটে গিয়া তীর পড়িল, এক জনের তীর পাখীর গায় লাগিল, কিন্তু চক্ষু বিদ্ধ হইল না। তখন সকলে হতাশ হইযা চারিদিকে দৃষ্টি করিতে লাগিল। হঠাৎ একটী বালক তীর ধনু হস্তে রণপ্রাঙ্গনে প্রবেশ করিল এবং লক্ষ্য ভেদ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। সকলে অবাক হইয়া এই সুন্দর বালককে দেখিতে লাগিল। হংসেশ্বর রায় বালকের নাম ও ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক উত্তর করিলে তিনি তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। বালক তীর ছাড়িল। অদ্ভুত শিক্ষা—তীর ঠিক পাখীর বামচক্ষু ভেদ করিল। সকলে উচ্চৈঃস্বরে বালকের প্রশংসা করিতে লাগিল, রাজা স্বয়ং পুরস্কার দেওয়ার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন এবং বালককে ডাকাইলেন। বালক ঐ গোলমালের সময় কোথায় যে মিশিয়া গেল, তাহা কেহ ঠিক করিতে পারিল না। তাহার অনুসন্ধানের ত্রুটি হইল না, কিন্তু কেহই আর

তাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন রাজা অন্যান্য সকলকে পুরস্কার বিতরণ করিয়া রণ-প্রাঙ্গন হইতে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

তারা-পৃথিরাজ

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মিবার নগর।

হবি মন্দির সম্মুখে পুষ্পোদ্যান।

(পৃথ্বীরাজ ও সংগ্রাম সিংহের প্রবেশ)।

পৃথ্বি। ও কি কথা বল সখা।

সংগ্রা। ঠিক কথা বলিযাছি আমি যুবরাজ।
নারীর অধরে সুধা তীব্র হলাহল
সদা থাকে লুক্কায়িত অন্তর মাঝারে।

পৃথ্বি। ক্ষান্তি দাও, ক্ষান্তি দাও, হেন ছার কথা
না বলিও আর। তব বিষ বাক্যবাণ
পশিয়া শ্রবণে মরমে বিন্ধিল মোর।
বৃথা কেন আক্রমণ কর নারীকুলে ?
অভাগিনী নারীকুল কোন ক্ষতি তব,
নাহি করিয়াছে ! দোষারোপ ঘৃণা ভবে,
কেন তবে করিতেছ তাহাদের শিরে ?

সংগ্রা। নারীইত আনিয়াছে দুঃখ কষ্ট সব
এ মেদিনী মাঝে। কুহকিনী নারীকুল
কুহকে ভুলায় যত নর সিংহগণে !

পৃথ্বি। দযাময় দীননাথ সৃষ্ট রাজ্যে নারী
এক অপরূপ শাখী। দয়া, প্রেম, স্নেহ,
প্রীতি, সরলতা আদি কতেক সুফল
প্রদানিছে প্রতিদিন। এই বিশ্বধাম
করে শান্তি নিকেতন ! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে
জ্ঞান-রাজ্য, ধর্ম্ম-রাজ্য করিতে বিস্তার
রমনীই লক্ষ্মী স্বরূপিনী বিভু-দূতী।
নারীই কুসুম কোমল লাবণ্যময়ী,
মানব জীবন-সিন্ধু মাঝারে হীরক-
তরণী স্বরূপা। বসুন্ধরা কুঞ্জ মাঝে
সুরভি নিশ্বাস। বিশ্ব সংসার কাননে
লতিকা অমিযময়ী ! নির্ঝরিণী সম
অমৃত-উৎস রূপে ঝরে নিশিদিন।
অজ্ঞানতা মোহময় অন্ধতম কূপে
হইযা পতিত, চিনিতে নারিল নারী
মানব-দানব। তাই এত দুঃখ বিশ্বে।
কামিনীই হৃদয়ের পূজনীয়া দেবী।
প্রীতিময়ী শান্তিময়ী নারী সহবাসে
মানব পিশাচ হয় মূর্ত্তিমান্ দেব।

সংগ্রা। তবে কেন নারীকুল হিংসাপরায়ণা।
দানবী আকারে সদা ভ্রমিছে সংসারে ?
দয়া, ক্ষমাগুণ রাজি গিয়াছে ভুলিয়া।
কূটিলতা মূর্ত্তিমতী পিশাচিনী নারী।

পৃথ্বি। হেন কথা কভু ভাই না বলিও আর।
সত্য বটে রমনীর হয়েছে দুর্গতি।
রমণী-মহত্ব রবি গেছে অস্তাচলে।
ভেবে দেখ রমণীর হেন দুরবস্থা
কেন হইয়াছে ? মানব-পিশাচ-করে
নিজ মহা শক্তি তারা গিয়াছে ভুলিয়া।
পিশাচ-সঙ্গিনী তারা হইয়াছে বলি।

আজ রত্ন-প্রবাসিনী ভারত নির্জীব
অসাড়! হয়েছে দগ্ধ মরুভূমি সম
সোনার ভারত। শত ধারে শান্তিধারা
করিতে হইলে প্রবাহিত, জ্যোতিহীনা
বিষাদিনী নারী দলে কর জাগরিত।
অজ্ঞানতান্দোলিত হৃদয়ে ঢেলে দেও
পূর্ণ জ্যোতিঃ, মুদিত নয়ন যুগে দেও
জ্ঞান-প্রভা। তাহলে মধুর শান্তি-স্রোত
নিশি দিন ধরা ধামে প্রফুল্ল অন্তরে
বহি যাবে। স্মরিলে অতীত স্মৃতি হয়
সুখের সঞ্চার মনে। ফুল্লা সরোজিনী
পতিরতা প্রণয়িনী' প্রেম মন্দাকিনী
দময়ন্তী সতী, সহস্রাক্ষ, নিশাকর,
ধর্ম্মরাজ, অগ্নিপতি আদি দেবগণে
করি হতাদর, নলরাজ গলে মাল্য
দিয়াছিল প্রেম ভরে। বিষাদ বদনে
বিজন বিপিনে ছিন্ন মলিন বসনে
নাথের বিরহ জ্বালা সহিতে না পারি
হৃদি ভেদী রোদনের রোলে বনস্থলী
করে ছিলা প্রকম্পিত। জনক দুহিতা
নারীকুল শিরোমণি নলিন নয়না
দুর্ব্বিসহ দুঃখ কষ্ট কত ভুঞ্জে ছিলা।
দুগ্ধফেননিভ সুকুসুম সুকোমল
শয্যা, কমল-কোমল উপাধান করি
পরিহার, করিত সুষুপ্তি লাভ সুখে
পর্ণ শয্যোপরি। যে অসূর্য্যম্পশ্যারূপা
রাঘব-রমণী অন্তঃপুরান্তর নাহি
কোন কালে হয়েছিল, যার মুখ-বিধু
বিমান-বিহারী বিহঙ্গমগণ কভু
নাহি পেত দর্শন করিতে, রাজকন্যা
রাজ বধু, কোমলাঙ্গী হেমলতা সীতা
দীনা হীনা তপস্বিনীবেশে বনে বনে
করেছিলা পর্য্যটন। দাক্ষায়ণী সতী
সতীত্বের শান্তিময়ী বিভা রেখে গেছে
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে। মানব হৃদয়ে
অক্ষয় উজ্জ্বল হেমাক্ষরে এই সব
পুণ্যবতী সতী কথা রয়েছে অঙ্কিত।
হেন নারীগণে সখা কর হতাদর?

সংগ্রা। পায় ধরি তব ছাড় কথা রমণীর।

পৃথ্বি। রমণীরে কেন এত ভয় কর তুমি।
কেনইবা এত ঘৃণা? ক্রুদ্ধ ফণী সম
কেন আছ দাঁড়াইয়া?

সংগ্রা। ভাল, ভাল, যথেষ্ট হয়েছে বলা।

পৃথ্বি। কেন এত রোষ কর মোর প্রতি সখা?

সংগ্রা। রোষ কই? রোষ নাহি করি কারু প্রতি!

পৃথ্বি। ভাল, ওই হের মধুময়ী দয়াবতী
দেব-দূতী পবিত্রতা সরলতাময়ী
সাবিত্রী রূপসী, ফুল্ল চিতে স্মরণীয়
অক্ষয় অমূল্য কীর্ত্তি কনক-মুকুট
ধরি শিরোপরি, ছড়াইছে শান্তি ধারা
এ বসুধা শিরে!

সংগ্রা। কই সখা, আমিত হেরিতে নাহি পাই!

পৃথ্বি। মানস-নয়ন দিয়া কর দরশন
তা হলে সুনিশ্চয় হেরিতে পাইবে।

সংগ্রা। দেখা দেখি করিবার নাহি প্রয়োজন।
হের ভাই কত ফুল ফুটিয়াছে হেথা।

পৃথ্বি। নয়নরঞ্জন বেল মল্লিকা মালতী
য়ে বিকশিত চারুরূপ রাশি হাসি
প্রকাশিছে। চিতহারী মধুর বিমল
কিশলয় মধুমাখা মধুহাস্যে কিবা

করিতেছে মহীরুহ-শোভা-সংবর্দ্ধন।
বিকচ কমল শোভে মেদুর কমলে।
প্রেম-মদ-মাতোয়ারা মলয়-মারুত
ফুল্লচিতে প্রেম-গীত গাহিয়া গাহিয়া
কুসুম কোমল বদন-চুম্বন-সুখ
সম্ভোগের আশে বেড়াইছে ঘুরি ফিরি।
লতাকুঞ্জ পুষ্পপুঞ্জে হয়ে সুশোভিত
প্রকৃতির শিরোপরি চন্দ্রাতপ চারু
মধুর বিচিত্র ধরিয়াছে মরি কিবা!
দয়াবান পাদপ-নিচয় করুণায়
পরিতুষ্ট হয়ে তাহাদের যশোগীত
গাহিয়া গাহিয়া মহানন্দ উড়িতেছে
যত বিহঙ্গমদল অম্বর-প্রদেশে।
মনসুখে সুমধুর কলকণ্ঠস্বরে
করিছে বসন্ত-দূতে রণে পরাভূত।
স্বাধীন কাননচারী মত্ত বিহঙ্গের
সুললিত-গান, ফুলমধু-পানাসক্ত
মধুকর নিকরের মধুর ঝঙ্কার
করিছে প্লাবিত কিবা চারু-উপবন।
চিত্রভানু এবে নহে চিত্রভানুসম।
ধরণী-সুন্দরী সুখময়ী বলে হয়
বোধ। যেন ত্রিদেবের মধুরতাময়
অনন্ত ঐশ্বর্য্য হেথা আজি বিরাজিত।
মধুমাখা মধুকণ্ঠে মধুর মঞ্জরী
হাসিভরা মুখ নিয়া গাইতেছে গীত।
এই প্রেমোদ্যান যেন চির শান্তিময়
চিরহাস্য-বিকশিত-সদাসুবাসিত।
পৌলোমীরঞ্জন নন্দনকানন-নিভ
মুনি-মন-মোহকর বিশ্ববিমোহন।
নিরুপম শোভা মরি খেলিতেছে হেথা।

সংগ্রাম। ঠিক কথা বলিয়াছ ওহে মিত্রবর।
ভ্রমর-শ্যামল যেন চিকুরের দাম
পরিধান করি কম কুসুম-মালিকা
ফলেশ্বরী বনদেবী হেথা বিতরিছে
মধুর-সরভি আজ পারিজাত-সম।

পৃথ্বি। চল এবে যাই মোরা এখান হইতে
গৃহমাঝে।

সংগ্রাম। চল তবে সখা।

(গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

নরনারীগণ, ভরিয়া পরাণ,
হরি দয়াময়ে ভজরে সবে।
ভক্তি-সচন্দনে, প্রেম দয়া সনে,
রাতুল চরণে দেওরে এবে॥
মোহমদ ভরে, পাপ তাপ সরে
ডুবিস্ কেন রে তোরা ঃ—
পাপ পরিহর, পুণ্যপথ ধর,
অলৌকিক সুখ পারিবে ভবে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মিবার রাজধানী—রাজসভা।

(রায়মল্ল ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রায়মল্ল। হায় মন্ত্রী! কি হবে উপায়?
ভাবিয়া হলাম সারা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী এ মিবার ভূমি
প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান নিকটে আমার।
কিন্তু মন্ত্রীবর!
পুত্রত্রয় অপ্রণয় দরশনে
স্বতঃই ভয় জন্মে মম মনে
ভীষণ বিবেক-অনল

গ্রাসিয়াছে পুত্রত্রয়ে।
সেই হেতু তারা মূঢ়মতি
পবিত্র সুভ্রাতৃ-বন্ধন
ছেদিয়াছে মোহভরে।
বিসর্জ্জিয়া স্নেহ-ধনে
হৃদয়-শোণিত-পানে
হইয়াছে দৃঢ়ব্রত এবে।
ভ্রাতৃরক্তে সিংহাসন হ'লে কলঙ্কিত
ভিত্তি নাহি স্থায়ী হয় কদাচন।
সলিল বুদ্বুদ-সম উহার অস্তিত্ব
সদা ক্ষণস্থায়ী, এই আছে এই নাই।
তাই অশান্তিদেবী দুঃখ-দায়িনী
দেখাইছে দিবস-রজনী
বিভীষিকা ভয়ঙ্করা মোরে
ভৃঙ্গবৃন্দ গুঞ্জরণ করে
ফুল্লচিতে ফুলমধু হরে
কিন্তু মন্ত্রী! শান্তি নাহি দেয়!
সুধাকর নিশাকর
সমতীব্র বিষাকর
মম অঙ্গ দহিতেছে।
সুশীতল সান্ধ্য-সমীরণ
না জুড়ায় প্রাণ মন।
শুন মন্ত্রী, অমাত্যনিচয়,
জানিও নিশ্চয়,
অন্তর্বিপ্লব অতি ভয়ানক।
রাজ্য মোর তীব্র হলাহল
করিবেক বরষণ
ছি, ছি, ছি লজ্জার কথা
কহিতে অপ্রিয় বারতা
বলিতে হইল মোরে।
পবিত্র সুদৃঢ় শান্তি-পাশে
মম রাজ্য বাঁধিবার আশে
পুত্রত্রয়ে করিব নির্ব্বাসিত।

মন্ত্রী। রাজন্!
নির্ব্বাসনের এ নহে সময়
এবে অতি অসময়
কায়মনোপ্রাণে
অতি সযতনে রাজপুত্রগণে
তুষিগে মধুর বচনে।
রাজপুত্রগণ নিশ্চয়ই রাজন্
হিংসা, দ্বেষ, পরিহরি,
পরস্পর বদ্ধ রহিবেক
মধুর শান্তির আলিঙ্গনে।

রাণা। বেশ কথা মন্ত্রীবর কহিয়াছ তুমি।
চেষ্টা করে দেখ সাধ্যমতে
উহাদের রুদ্ধ বিবেকের দ্বার
যদি পার খুলিবারে।
উহাদের বিমলিন জ্ঞান-কক্ষ
যদি পার আলোকিতে।
আমি যাই এবে বিশ্রাম-আগারে।

(রায়মল্লের প্রস্থান)

মন্ত্রী। পুত্রত্রয়ের ঔদ্ধত্য দরশনে
রাণার ভীষণ ক্রোধানল
হইয়াছে উদ্দীপিত।
সেই হেতু পুত্রত্রয়ে করিবারে নির্ব্বাসিত
হ'য়েছেন স্থিরচিত্ত।
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজপুত্র সঙ্গ
অগ্রজন্ম হেতু
করিবারে সিংহাসন অধিকার
ন্যায়মত যোগ্য পাত্র।

জয়মল্ল উদ্ধত স্বভাব
বিবেক হয়েছে নির্ব্বাক
লভিতে মিবার সিংহাসন
করিয়াছে প্রাণপণ।
নিশ্চয়ই রাজপুত্রত্রয়
লভিবারে রাজসিংহাসন
স্ব স্ব স্বার্থ সিদ্ধি তরে
পরস্পর পরস্পরে
ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্রের সমান
করিবেক আক্রমণ।
উদ্গারিছে হিংসানল
ঘন কৃষ্ণ ধূমরাশি।
ভীষণ বিদ্বেষ স্রোত-গতি
রুধিবারে না দেখি উপায়।
সাধ্যমতে দেখি চেষ্টা করে
যদি পারি রাজপুত্রগণে
বাঁধিতে প্রেম-সূত্রে।
হে দীননাথ!
দয়া করে পুরাইও
মম হৃদয়ের আশা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ।

কালো'র দেবতা।

মানুষের মনে যেমন কোনও কোনও সময়ে সুখের আসনটী দুঃখ আসিয়া অতর্কিতে নিতান্ত আকস্মিকভাবে অধিকার করিয়া বসে, সে দিনকার আঁধারময়ী বর্ষা-নিশিও তেমনি মহা-কালীর রণসাজ পরিয়া আসিয়া ডাকিনী-যোগিনীর মত জলভরা কালো কালো মেঘ-গুলিকে সমস্ত আকাশের গায়ে ছড়াইয়া দিয়া-ছিল। কর্ম্মক্লান্ত অজিতকুমার পল্লীর খোলা মাঠে দিনের শেষের সুখস্পর্শ মৃদু বাতাসে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। এতক্ষণ অনন্যমনে কি যেন ভাবিতেছিলেন, হটৎ মাথা তুলিয়া আকা-শের অবস্থা দেখিয়া বৃষ্টির আশঙ্কা করিলেন। পল্লীপ্রান্তের অনতিদূরে মাঠের ধারেই আপনার ধবল অট্টালিকা শ্বেত হংসীর মত গ্রীবা উঁচু করিয়া আছে দেখিতে পাইয়া সেই দিকেই রওনা হইলেন।

অজিতকুমার বাড়ী আসিয়াই আপনার পড়িবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, তাঁহার লাবণ্য-ময়ী যুবতী পত্নী প্রমীলা "ডুরে" শাড়ী পরিয়া গালিচার আসনে বসিয়া সুর করিয়া "Illiod" পড়িতেছে। অজিতকুমার ঘরে প্রবেশ করিবা-মাত্র প্রমীলাদেবী পড়া বন্ধ করিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া স্বামীর জুতামোজা খুলিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। মোজা খুলিয়া রাখিয়া আপনার কাপড়ের আঁচল দিয়া স্বামীর জুতার ধুলা ঝাড়িতে লাগি-লেন। অজিতকুমার বলিলেন—"অমন সুন্দর কাপড়খানা যে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না তা'? অমনি করেই ত তুমি দু'দিনেই কাপড় ময়লা কর, আর মাসে দশখানা কাপড় ছেঁড়'।"

"ছিঁড়িত' বেশ করি—এ কাপড়গুলো আমার নিজের টাকায় কেনা, তা জেনে রেখো।"

"তা হ'লেই বা—তাই বলে তুমি নষ্ট ক'রবে! আর চেয়ার টেবিল থাকতে গালি-চার আসনে মাটীতেই বা বসা কেন? যেমন

তুমি, তেমনি তোমার বোনটী, লেখাপড়া শিখে তোমরা এ হচ্ছ কি!"

"বেশী ব'কোনা—একটু বিশ্রাম কর এখন, সমস্ত দিনটা খেটেও কি রোজ সন্ধ্যার সময় আমাদের সঙ্গে ঝগড়া না করলে তোমার ক্ষুধা হয় না, তোমার "কালো" যে "ফার্ষ্ট ডিভিসনে" ম্যাট্রিকুলেশন' পাশ করেছে—শুনেছ,এই একটু আগেই নলীনবাবু খবর দিয়া গেলেন।"

অজিতকুমারের সত্যই সমস্ত দিনের ভিতর কাজের বিরাম ছিল না—কিন্তু এ দিবসব্যাপী শ্রম তাঁহার ইচ্ছাকৃত। তিনি যেবার ডাক্তারি পাশ করিয়া এম. বি উপাধি পাইয়াছিলেন? সেইবার তিনি ষোড়শ বর্ষীয়া বালিকা ধনী কন্যা লাবণ্য-প্রতিমা প্রমীলাকে ঘরে আনিয়াছিলেন। প্রমীলা সেবার প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া ছিল।

বিবাহের পর অজিতকুমার কিন্তু ধনীর সন্তান হইয়া একটী দিনও অলসের মত বসিয়া কাটান নাই। বিষয় কর্ম্ম করিয়া যেটুকু অবসর পাইতেন, তাহা তিনি পরোপকার করিয়া ও বই পড়িয়া কাটাইতেন।

অজিতকুমার অর্থের প্রত্যাশী হইয়া ডাক্তারি পড়েন নাই। পীড়িতের সেবা, গরীব দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে—অর্থাভাবে যাহারা রোগের সুচিকিৎসা করাইতে না পারিয়া—বুকের রক্ত জল করিয়া, সেই জল অশ্রু রূপে ঝরাইয়া প্রাণাধিক প্রিয়জনকে সিঞ্চিত করতঃ মৃত্যুর চরণে অর্ঘ্য দেয়—তাহাদেরই সাহায্য-কল্পে অজিতকুমার ডাক্তারি পড়িয়াছিলেন। বিবাহের দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই অজিতকুমার—প্রমীলা উভয়েরই পিতামাতা ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

পিতামাতার মৃত্যুর পর পিত্রালয়ে আপন বলিতে তার পঞ্চদশ বর্ষীয়া অনূঢ়া ভগ্নী—"কালো" ব্যতীত প্রমীলার আর কেহই রহিল না। প্রতিভাময়ী অনাথা বালিকা "কালো" পিতামাতার অভাবে করুণাময়ী দিদির স্নেহ-কোলে আশ্রয় লইল।

"কালো" প্রমীলার তিন বৎসরের ছোট, প্রমীলা তার দিদি,কি বন্ধু, প্রমীলা তার কি, তা সে বুঝিতে পারিত না, প্রমীলাহীন পৃথিবীর অস্তিত্বই যেন তার কাছে অসম্ভব বোধ হইত, প্রমীলারও ঠিক তেমনি। প্রমীলার বিবাহের চারি বৎসর পরে সতের বছর বয়সে তার প্রাণাধিকা "কালো" প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া আজ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে; প্রমীলার আনন্দের উৎস আজ সমুদ্রের জোয়ারের মত আবেগে বুক ভরিয়া ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

প্রমীলা বলিল—"আমি যে সুখবর দিলাম তার পুরস্কার কি দেবে?"

অজিত ডাকিলেন—"কালো।"

"কালো" তখন অজিতকুমারের বিকালের জল খাবার হাতে করিয়া ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, ঘরে ঢুকিয়াই বলিল—"আমায় ডাকছিলে দাদা? দিদি, দাদার হাতমুখ ধোবার জল দিইছি, পা ধুইয়ে দিয়ে যাও।"

অজিত বলিলেন—"কালো, ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করেছিস।"

"পুরস্কার চাইব দাদা?"

"কি পুরস্কার চাস্ ?"

কি পুরস্কার যে তাহাদের প্রার্থনীয়, কালো ও প্রমীলা তাহা অজিতকুমারকে জানাইতে অস্বীকার করিল, তাহাদের নিজের যে কোনও জিনিষ পছন্দ হইবে, তাহারা জোর করিয়া লইবে, সে জন্য তাঁহার মতামতের অপেক্ষা করিবে না।

কালোর পরামর্শ অনুসারে প্রমীলা সে দিন অজিতকুমারের 'পা ধুইবার চৌকির কাছে বড় একটী পিতলের বাটী রাখিয়া দিয়াছিল, আহারের পূর্ব্বে সে দিন কালো ও প্রমীলা যে তাঁহারই পা ধোয়া জল পুরস্কার রূপে ভক্তিভরে পান করিয়াছিল, অজিতকুমার তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

(২)

সমস্ত দিনটী "দাসেদের ছেলের" রোগ শয্যার পাশে অনাহারে কাটাইয়া অজিতকুমার সেদিন যখন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিলেন, কালো ও প্রমীলা তখন অবসন্ন-দেহে রান্না ঘরের দাওয়ায় শুইয়া পড়িয়াছিল; অজিতকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা খেয়েছ ?" তাঁহার সে কথার কেহ উত্তর দিল না। কালো জিজ্ঞাসা করিল—"দাসেদের ছেলেটি এখন কেমন আছে দাদা ? সমস্ত দিনটা কিছুই খাও নাই। ওঠ দিদি; শীগ্‌গির করে দাদার হাত পা ধুইয়ে দাও গে, আমি ভাত বাড়ি।"

"ছেলেটি এখন ত একটু ভাল আছে। যাক, তোমাদের সকলই বাড়াবাড়ি—তোমরা কি এমনি করে পাগল করে তুল্‌বে। কাল সমস্ত দিনরাত্রি একাদশী করে কাটিয়েছ, আজও এত বড় দিনটা গেল, এখনও মুখে কিছু দিলে না।"

অজিতকুমার আহারে বসিয়াছিলেন, কালো উপরে পান সাজিতে গিয়াছিল। প্রমীলা সে-দিনকার শুষ্ক বিশীর্ণ সৌন্দর্য্য লইয়া উপবাস ক্ষীণ অবসন্ন হস্তে আহাররত স্বামীকে বাতাস করিতেছিল।

অজিতকুমার কালোর বিবাহের কথা পাড়িয়া প্রমীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নলীন বাবুর হাতে কালোকে দিলে কেমন হয়।" তাঁহার বিশ্বাস নলীনবাবু সাধারণের মত বাহিরের চাক্‌চিক্যের অন্ধ উপাসক নহেন, কালোর অন্তরের লাবণ্য, তাহার মুখের প্রতিভার আভা নলিনবাবু দেখিতে পারিবেন--পূজাও করিবেন।

কালো কিন্তু কিছুতেই বিবাহে রাজী হইল না। পিতামাতার স্নেহে আদরে ভরপূর, বাল-সুলভ সুখ-স্বপ্নে মগ্ন কালো ও প্রমীলা দুইটী ভগ্নী যখন হাতধরাধরি করিয়া "শিউলীতলায়" খেলা করিত, সেই খেলার মাঝে একদিন সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহারা দুই জনে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, সুতরাং কোনও মতেই বিবাহ করিয়া পরবশ হইবে না।

ষোল বছর বয়সে প্রমীলা যখন প্রস্ফুট নব-কিশলয়ের মত কিশোরী-প্রাণ ভক্তি-বারি সিঞ্চিত করিয়া তাহার কুমারী-গর্ব্ব, জ্ঞান-গর্ব্ব ধুইয়া মুছিয়া তাহার "সুরলোকের সুষমামণ্ডিত জীবনদেবতা" অজিতকুমারের চরণতলে অঞ্জলি দিয়াছিল, কালো তখন যেন জীবন-সমরের একমাত্র সঙ্গিনী হারাইয়া বিবাহ-অরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিবার জন্য নব চর্ম্মে বর্ম্মে সুসজ্জিত

হইয়া সঙ্কল্প দৃঢ়তর করিয়া কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নলীনের সহিত বিবাহ-প্রস্তাবে কুমারীর খরধার তরবারি নূতন করিয়া শাণিত করিয়া লইল।

নলীনবাবু "ক্যালকাটা ইউনিভারসিটীর" বি-এ উপাধিধারী টেড়িকাটা চশমা আঁটা সুন্দর নব্য যুবক।

চির-যত্ন-পালিতা, চির-স্নেহের জীবনসঙ্গিনী "কালোকে" জোর পূর্ব্বক বিবাহ দিয়া অসুখী করিতে প্রমীলার মত ছিল না, অজিতকুমারেরও ইচ্ছা ছিল না। তবে যদি কুমার-কুমারীর নিঃসঙ্গ প্রণয়হীন হৃদয় পরস্পরের প্রতি স্বেচ্ছায় আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার বড় সাধের "কালোর" বিবাহ দিয়া প্রমীলা স্বর্গসুখ অনুভব করিবেন, সেরূপ বিবাহে অজিতকুমারেরও অনিচ্ছা ছিল না।

নলিনবাবু অজিতকুমারের বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। প্রমীলা তাহাতে উৎসাহ দিত। প্রমীলা ভাবিল—নলীন সুরভি-কুসুমের স্নিগ্ধ সৌরভ হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতেছে; "কালো" কুসুমের কাছাকাছি ফুটিয়া প্রমীলা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না—"নলীন মধুকর" কোন্ গন্ধ-মধুর কুসুমের গন্ধে বিভোর হইয়া প্রতিদিন ছুটিয়া আসিত, মুখ-বন্ধনের কপট গাম্ভীর্য্য ছাড়িয়া নলীনবাবু যখন দ্বিতীয়স্তরে হাস্যরসের অবতারণা করিলেন—প্রমীলা তখন ভাবী ভগ্নিপতির কৌতুক প্রিয়-তায় উৎসাহ না দিলেও আপত্তি করিতে পারিল না, ভদ্রতা ও স্ফুর্ত্তিজিতার খাতিরে কখনও মৃদু হাসিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হইত।

শিক্ষিত নব্যযুবক নলীনবাবু কিন্তু সেই মৃদু-হাস্যরূপী নীরব সহানুভূতির অন্য অর্থ করিলেন। স্নেহময় সরল-হৃদয় অজিতকুমার এ সকল বিষয়ে একরূপ উদাসীন ছিলেন, পরোপকারই ছিল তাঁর জীবন-ব্রত, তাঁর নিশিদিনের চিন্তার বিষয়। এ সকলে তিনি উৎসাহ না দিলেও প্রমীলার কার্য্যে কোনও বাধা দিতেন না। তাহার বড় স্নেহের "কালো" যে বিবাহ করিয়া সুখী হইবে, এ কল্পনায় তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন।

নলীনবাবু "কালোকে" বিবাহ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু "কালো" যে পর্য্যন্ত সম্মতি না দেয়, যে পর্য্যন্ত প্রসন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে—ইহাই প্রমীলার বাসনা। কালোর কিন্তু নলীনবাবুকে দেখিলে অন্তরের সমস্ত বিরাগ-বহ্নি যেন একসময়ে জ্বলিয়া উঠিত। নলীনবাবুর আগমনে "কালোর" মুখে একটা বিরক্তি ও আশঙ্কার চিহ্ন যুগপৎ ফুটিয়া উঠিত। "কালোর" জীবনের ব্রত—অজিতকুমারের সেবায়, প্রমীলার সহায়তা করা, প্রমীলাকে নিত্য উৎসাহিত করা। অজিত-কুমারের অর্থের অনাটন ছিল না, ইচ্ছা করি-লেই রাঁধুনী রাখিতে পারিতেন, কিন্তু কালো "নাছোড়বান্দা" হইয়া ঝগড়া করিয়া তাঁহাকে শত মাথার দিব্য দিয়া তাঁহার সে সঙ্কল্প মুকুলেই নষ্ট করিয়াছিল। সাধ করিয়া কালো দু'বেলা রাঁধিত। প্রমীলা যদি কোন দিন রাঁধিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কালো তাহাতে আপত্তি করিত না, একটী কথাও বলিত না; শুধু তাঁহার চোক দু'টী ছল ছল করিয়া জলে ভরিয়া

উঠিত, প্রমীলা ভাবিত—কৌতুকচ্ছলেও স্বামীর সেবায় অবহেলার ভাব দেখাইলে যে "কলহ-প্রিয়া" কালো তাহাকে দশটা কথা না শুনাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হইত না, সে কালোর একি অদ্ভুত প্রকৃতি! কালো ভাবিত—অজিতকুমারের পূজায় তাহার তেমনি অধিকার না থাকিলেও পূজারিণী প্রমীলার অঞ্জলির ফুল আহরণ করিবার অধিকারেও বঞ্চিত হইয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

* * * *

প্রমীলা এতদিনে বুঝিতে পারিল—নলীন মধুকর কোন পুষ্পের গন্ধামোদে পুলকিত হইয়া ছুটিয়া আসিত। সরল বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া অসন্দিগ্ধ হৃদয়ে প্রমীলা এতদিন যে নলীনের সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছে, সেই কিনা আজ তাহাকে প্রণয়লিপি লিখিতে সাহস করিয়াছে। মানুষ যে এত কপট, মনে মনে এমন করিয়া কালসাপ পুষিয়া মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে পারে, তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই!!!

সেদিন দুপুরবেলা রান্নাঘরে প্রমীলা যখন আপনার অনিন্দ্যসুন্দর কান্তির উপর অপর্য্যাপ্ত কেশপাশ ছড়াইয়া দিয়া, উনুনের পাশে দাঁড়াইয়া নলীনের চিঠিখানা পড়িতেছিল, কালো যে তখন নিঃশব্দে আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহা জানিতে পারে নাই, কালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পত্রের খানিকটা পড়িয়া ফেলিয়াছিল। পড়িয়া তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, কতকটা বুঝিল—কতকটা বুঝিল না। ভাবিল প্রমীলা তাহাকে সকল কথাই স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিবে। প্রমীলা চিঠি পড়িয়া উনুনের জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করিল, কাহাকেও কিছু বলিল না, কালো ভাবিল—"এ সব কি?"

নলীনবাবুর ঘৃণিত চিঠির কথা প্রমীলা অজিত বা কালোর নিকট বলিতেও ঘৃণাবোধ করিল, প্রথমে ভাবিল—পত্রের জবাব না দিয়া সে আসিলে আপন মুখে অপমানের চূড়ান্ত করিয়া বাড়ী ঢুকিতে বারণ করিয়া দিবে। পরে ভাবিল—অমন নরাধমের সহিত কথা বলা দূরে থাকুক, উহার মুখ দেখিলেও পাপ হয়।

শেষ সিদ্ধান্ত করিল—দুই ছত্র লিখিয়া নলীনের মত ঘৃণিত চরিত্রহীন মূর্খকে একটু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। "নলীন, আমি তোমাকে আপন প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় "কালো" রত্ন দিতে গিয়াছিলাম, তখন তোমায় চিনি নাই, এখন তোমার মুখে লাথি মারিতেও ঘৃণাবোধ করি। আমাদের বাড়ীতে আর ঢুকিও না।" প্রমীলা একদিন নলীনকে এই কয়েকটী কথা লিখিবে মনে করিয়া "নলীন, তোমাকে আমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও" লিখিতেই তাহার জীবনদেবতা অজিতকুমার সারাদিনের পরিশ্রমের পর বড় পিপাসিত হইয়া আসিয়া এক গ্লাস জল চাহিয়াছিল, জীবনসর্ব্বস্বের শুষ্ক-মলিন মুখখানির দিকে চাহিয়া অসমাপ্ত লিপির সম্বন্ধে সকল সতর্কতা ভুলিয়া স্বামীর জন্য ছুটিয়া জল আনিতে গিয়াছিল। কালো অজিতকুমারের জুতা মোজা খুলিতে শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়াছিল। প্রমীলার পরিত্যক্ত পত্রিকা তুলিয়া লইয়া কালোকে দেখাইয়া অজিতকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কালো,

এ কি ?" কালোর ম্লান মুখখানি একমুহূর্ত্তে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল।

অজিতকুমারের সন্দেহ ও ঔৎসুক্য বাড়িতে লাগিল; বিহ্বল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি জানিস্ কালো, বল ?"

কালো কখনও মিথ্যা বলিত না, আজ অজিতকুমারকে কি বলিবে! বলিল—"কি বলিব দাদা ?"

অজিতকুমার স্বপ্নাবিষ্টের মত প্রমীলার অসমাপ্ত লিপি যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন, পতি-গতপ্রাণা প্রমীলা এ সকলের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না।

নলীনবাবু যে সেদিন অজিতকুমারের বাড়ী ঢুকিতেই কালো তার স্বাভাবিক সকল লজ্জা ও সঙ্কোচ একটা কঠোর কর্ত্তব্যের সুদৃঢ় পাথরে চাপা দিয়া নলীনবাবুকে তাহাদের বাড়ী ঢুকিতেই বারণ করিয়া দিয়াছিল—প্রমীলা তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই।

নলীনবাবু আর আসিল না। প্রমীলা ভাবিল—নরাধমকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হইল না।

সে যদি ভুলিয়াও ভাবে যে প্রমীলা তার অনুরাগিনী, তার ঘৃণিত পত্র পড়িয়া যে কিছু-মাত্র বিরক্ত হয় নাই, সে কথা মনে করিতেও যে সমস্ত শরীরটা জ্বলিয়া উঠে। প্রমীলার ইচ্ছা নলীন আর একদিন আসে। তাই সে একদিন সরল প্রাণে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিল—"নলীনবাবু আর আসেন না কেন ?" সে সরল প্রশ্নের ভিতর যেন একটু আগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

অজিতকুমারের সন্দেহ বাড়িয়া গেল, শুষ্ক কণ্ঠে সংক্ষেপে উত্তর করিলেন—"কালো যখন বিবাহে নিতান্তই নারাজ,নলীনের সে ক্ষেত্রে না আসাই ভাল।"

* * * *

জ্যোৎস্না রাজ্যে এমনি করিয়া অন্ধকার আসিয়া জমিতে লাগিল, স্বামী সোহাগিনী প্রমীলার একি হইল! প্রমীলার "জীবন-দেবতা অজিতকুমার প্রমীলার ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি আর তেমন প্রসন্ন হাসিমুখে গ্রহণ করেন না কেন? স্বামী আর তেমন করিয়া সোহাগ করিয়া 'পমি বলিয়া কাছে ডাকিয়া আদর করেন না কেন? সান্ধ্য ভ্রমণের পর প্রমীলার পা ধোয়াইয়া দেওয়া আর তেমন ভাল লাগে না কেন? তাহার স্বামী দেবতার পূজায় কালো আগে ফুল যোগাইত, নৈবেদ্য সাজাইত, পূজা করিত—প্রমীলা। এখন প্রতিকাজেই প্রমীলাকে বাদ দিয়া শুধু "কালোকেই" ডাকা হয় কেন? অব-স্থার ফেরে পড়িয়া প্রমীলার পবিত্র হৃদয়েও এইরূপে সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ পড়িয়া সময় মত বৃষ্টি রৌদ্র পাইয়া চারা হইল, ক্রমে ভালবাসা লইয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। "কালোই কি তবে অজিত-কুমারের হৃদয়—"এ কথা মনে করিতেও প্রমীলা শিহরিয়া উঠিত।

কালো যে লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া নিজ-মুখে নলীনবাবুকে আসিতে বারণ করিয়াছিল, অজিতকুমার তাহা জানিতেন না, তিনি ভাবি-লেন—তিনি যে প্রমীলার প্রণয়লিপি দেখিয়া-ছেন, তাহার সতীত্বের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া-

ছেন, প্রমীলা তাহা জানিয়া বুঝিয়াই নলীনের সহিত পরামর্শ করিয়া সন্দেহ এড়াইবার জন্য তাহাকে নিজেই আসিতে বারণ করিয়াছে। অজিতকুমারের সন্দেহাকুল হৃদয় যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল. তরঙ্গের উপর তরঙ্গাঘাতে আকুল হইয়া হতাশের মত ভগ্নস্বরে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"তুই ছাড়া ইহ-সংসারে আমার আর কে আছে কালো?" দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রমীলা কথাগুলি স্পষ্ট শুনিয়াছিল, তাহার বুকের রক্ত জমিয়া যেন বরফের মত কঠিন হইয়া উঠিল।

কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে যে আগুণ জ্বলিয়া উঠিতেছিল, কালো যেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে যেন স্বপ্নের রাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আশা করিতেছিল, এ স্বপ্ন অচিরেই ভাঙ্গিয়া যাইবে, এ আঁধার যে ভাবেই হোক কাটিয়া যাইবে। অজিতকুমারের চির প্রফুল্ল মূর্ত্তি—দিদির হাসিভরা মুখখানি ও স্নেহাদর ভরা "কালো" ডাকই যে অনাথার জীবন-পথের একমাত্র অবলম্বন ছিল। প্রতি দিনের পানাহার অপেক্ষাও যা' তার প্রয়োজনীয়, তাহাতে বঞ্চিত হইয়া কালো কি চাহিয়া কি নিয়া বাঁচিয়া রহিবে? "কালোর" জীবনাকাশে যখন মেঘ বা অন্ধকারের লেশমাত্রও ছিল না, তখনও যে দিদি মুহূর্ত্তের জন্যও স্নেহালোক দানে বিরত হয় নাই, আর আজ এই ঝড়ের ও অন্ধকারের দিনে যখন সে পথ হারাইয়া আলোর জন্যই আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন যদি প্রমীলা-চপলা চমকের ক্ষণিক আলোকও কালোকে পথ দেখাইয়া না দেয়, তবে সে অন্ধকারময় জীবন-বনে কালো কি দেখিয়া, কেমন করিয়া পথ চিনিয়া চলিবে!

হাওয়া তখন মোটেই ছিল না। প্রকৃতি জননীর জ্যোৎস্নাভরা শ্যামল সুন্দর আননে মেঘের একটা কালো আবরণ পড়িয়া স্বামী-সোহাগিনীর অভিমান-ভরা মুখে গাম্ভীর্য্য ও অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল।

হৃদয়ে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে বারান্দায় শুইয়া নিকটবর্ত্তী নারিকেল গাছের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া "কালো"ভাবিতেছিল—তাহার এ কি হইল! আগে যাহাকে দেখিলে, যাহার কথা শুনিলে প্রমীলার মুখের উপর হাসির ফোয়ারা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া ছড়াইয়া পড়িত, এখন সেই "কালোর"ব্যথাভরা "দিদি" ডাকে, সেই মুখের সকরুণ স্নেহরস মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গিয়া মুখখানি "তাপদগ্ধ মরুভূমির" মত শুষ্ক নীরস হইয়া উঠে কেন? সন্দেহের বিষাক্ত বাতাস প্রমীলার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া তাহাকে যে একেবারেই অন্ধ করিয়া দিয়াছিল, কালো তাহা বুঝিল না।

* * * *

যখন প্রমীলার তীক্ষ্ণ রূঢ়স্বর শত শল্যের মত সেই সন্ধ্যার অন্ধকার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষত করিয়া অকস্মাৎ বলিয়া দিল—"কালো, তোর দিদির অকপট স্নেহপূর্ণ সরল বিশ্বাসের এমনি করিয়া প্রতিফল দিলি? এমন করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়া আমাকে স্বামী-রত্নে বঞ্চিত করিয়া তুই কি সুখী হবি কালো? এখন বুঝিলাম—

কেন তুই বিবাহের নামে এত জলিয়া উঠিস্!" তখন কালো বুঝিল—যে আগুন জলিয়াছে, তাহা বুঝি আর নিভিবার নয়!

সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকার, চাঁদের বিমল আলোতে মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই কালো সেদিনকার রাত্রির রান্না শেষ করিয়াছিল।

* * * *

অনেকটা রাত্রি হইয়াছিল। আপন শয়ন-গৃহের মুক্ত বাতায়ন-পাশে শুইয়া কালো যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

কষ্ট-জড়িত স্নেহ-পূরিত কাতর-কণ্ঠে কালো ডাকিল—"দিদি, একবার কাছে আস্‌বে?"

কালোর একি স্বর! সারাটা জীবনের প্রতিদিনকার স্নেহ-ভালবাসার, মান-অভিমানের স্মৃতি বুকে পূরিয়া একি স্বর মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রমীলার পাষাণ বুক বিদীর্ণ করিয়া দিল।

প্রমীলা কাছে আসিয়া কালোর শীর্ণ হস্তখানি আপন করে ধরিয়া আশা-পূর্ণ করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"একি কালো? অমন ছট্‌ফট্ কচ্ছিস্ কেন?"

"আমি ত যাচ্ছি—দিদি।

"একি বল্‌ছিস্ কালো?"

"কোলজার ভিতরকার সেই শিশিটার সব-টুকু—"

একমুহূর্ত্তে প্রমীলাকে কে যেন এক আঁধার-ভরা গভীর কূপে সজোরে নিক্ষেপ করিল।

"কি ক'রে আমায় ছেড়ে যাবি কালো—পারবি কি?"

কালো নীরব নিস্তব্ধ।

"সেদিন তোকে বড় নিষ্ঠুর কথা বলে-ছিলাম, ভুল করেছিলাম—অন্যায় করেছিলাম, তাই বলে কি একেবারে ছেড়ে চলে যাবি? এত কঠিন শাস্তি!"

"সে কথা সত্যি নয় দিদি।"

"আমি তা' বুঝেছি কালো—ক্ষমা কর, ছেড়ে যাস্‌নে, আমি থাকতে পারব' না, তোকে যেতে দেব' না।"

"একটা কথা বলব দিদি—রাগ ক'রো না, কেন তুমি নলীনবাবুকে চিঠি লিখ্‌লে? দাদার প্রাণে এমন করে ব্যথা দিলে কেন? সেই চিঠি দেখে অবধি দাদা—"

অকস্মাৎ প্রমীলার মাথায় কে যেন লোহার ডাণ্ডা দিয়া আঘাত করিল, এতদিনে সে বুঝিল—কোন্ জায়গায় আগুন ধরিয়াছে। এতদিন পরে প্রমীলা অসমাপ্ত পত্রের কথা খুলিয়া বলিয়া, চির-বিদায়ের দিনে যাত্রাকারিণী কালোকে বুঝাইয়া দিল যে সে মুহূর্ত্তের জন্যও অবিশ্বাসিনী হয় নাই।

* * *

অজিতকুমার সংবাদ পাইয়া তীক্ষ্ণ শর-বিদ্ধ কুরঙ্গের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"একি কল্লি কালো?—কতক্ষণ?"

কালোর যন্ত্রণা ও ছট্‌ফটানি থামিয়া আসিয়াছিল। স্থির করুণ-কণ্ঠে ধীরভাবে বলিল—"দাদা, আর সময় নেই। যাবার সময় বলছি—বিশ্বাস ক'রো—দিদি আমার অবিশ্বাসিনী নয়—" অসমাপ্ত পত্রের কথা ধীরে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া ক্ষীণহস্তে প্রমীলার কর-ধারণ করিয়া অজিতকুমারের কম্পিত করে স্থাপন করিল।

ভগ্নস্বরে অজিতকুমার বলিলেন—"কালো, আমাদের কেমন করে ছেড়ে চল্লি—কে আমায় আর তোর মত যত্ন করে বেঁধে দেবে?" এই কথায় কালোর মুখে একটা যন্ত্রণা ও অস্থি-রতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল।

ঝড়ের বিষম দৌরাত্মের শেষে যেন একটী করুণ-শান্ত-গাঢ় ছায়া মরণাহতার যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের উপর ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

সপ্তমীর চাঁদের স্নিগ্ধ আলোক মুক্ত বাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়া কালোর প্রশস্ত মুখের উপর খেলা করিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী বকুল গাছের ফুলগন্ধ লইয়া ঝির ঝির করিয়া ধীর বাতাস বহিয়া আসিতেছিল। পাশের বাড়ীতে "কালোর" কমলা সখীর বিয়ের সানাই রহিয়া রহিয়া সুর ধরিতেছিল, কালো তখন যাত্রা করিয়া চলিয়াছিল, দূরাগত বেণুধ্বনির মত ক্ষীণস্বরে বলিল—"তোমার দাসী—তোমারই কাজের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা কখনও করে নাই। দেবতা আমার! দাসীর মাথায় পা রাখিয়া আশীর্ব্বাদ কর' যেন পরজন্মেও—"

কালো আর বলিতে না পারিয়া অতি কষ্টে অজিতকুমারের পায়ে মাথা রাখিল। বাঁশীর সুর যেন ক্ষীণ—ক্ষীণতর হইয়া শেষে একেবারে থামিয়া গেল!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র বি-এ।

—

সত্যং সত্যম্।

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

(নৃসিংহ পুরাণ)

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি কার্য্য পশু ও মনুষ্য উভয়েরই সমান; কেবল ধর্ম্মই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করিতেছে। অতএব ধর্ম্মবর্জ্জিত মনুষ্য পশুর সমান। সেই কারণ মনুষ্য মাত্রেই ধর্ম্মপথে চলা, ধর্ম্মকার্য্য করা, ধর্ম্মরক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

"শ্রুতি স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্ম-মনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥"

(মনু সংহিতা)

শ্রুতি ও স্মৃতি যে যে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম। সেইরূপ ধর্ম্মাচরণ করিলে, মানব ইহলোকে যশঃপ্রাপ্ত হয়, এবং পরলোকে স্বর্গ-মোক্ষাদিরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম সুখ লাভ করিয়া থাকে।

"একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোহনুভুংক্তে সুকৃতমেক এব তু দুষ্কৃতং॥"

(মনু সংহিতা)

যখন জীবাত্মা জন্মগ্রহণ কালে একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুকালে একাকী মরে ও সুকৃত-কর্ম্ম এবং দুষ্কৃত-কর্ম্মের ফল একাকীই ভোগ করিয়া থাকে, তখন মানবমাত্রেই ধর্ম্ম-পালন করতঃ সুকৃত-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। সংসারে থাকিয়া, সাংসারী হইয়া,

ধর্ম্মপালন করা অতীব দুরূহ। নিতান্ত জ্ঞানবান্, বিদ্বান্,বুদ্ধিমান হইলেও সংসারে থাকিয়া কঠোর সংযম অবলম্বন করতঃ সকল প্রকারে ধর্ম্মপালন করা কখনই সম্ভবপর নহে; কিন্তু তাই বলিয়া সংসারে বাস করিলে, সংসারী হইলেই যে অধার্ম্মিক হইতে হইবে, তাহা নহে। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মরক্ষা করার একটী সহজ উপায় আছে। সেইটী—"সত্যপালন।"

হিন্দুদিগের যাবতীয় পুরাণ গ্রন্থে, যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থে সত্যের অপার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"অশ্বমেধ সহস্রস্তু সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেবাতি রিচ্যতে।"

(কেনোপনিষদের ভাষ্যে ভগবান্
ভাষ্যকার-ধৃত স্মৃতি-বচন)

অর্থাৎ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্তির ন্যায় সৌভাগ্য লাভ হয়; তাহার সহস্র অশ্বমেধকে একদিকে, আর একমাত্র সত্যকে একদিকে, পরিমাণের নিমিত্ত তুল্যদণ্ডে ধারণ করিলে, অশ্বমেধ অপেক্ষা এক সত্যের ওজন অতিরিক্ত হয়।

"চতুষ্পাৎ সকলো ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈব কৃতে যুগে।"

(মনু সংহিতা)

অর্থাৎ সত্যযুগে সকল ধর্ম্ম যে প্রকার পরিপূর্ণ ছিল, সত্যধর্ম্মও সেইরূপ পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু মনু-সংহিতার এই বচনে একটু সন্দেহ ছিল, কেন না, যখন সত্যের অপার মহিমা, যখন সত্য একটী প্রধান ধর্ম্ম, তখন তাহাকে সকল ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া বলা হইল কেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? ভগবান্ কুল্লুকভট্ট এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, যথা—

"সকলধর্ম্ম শ্রেষ্ঠত্বাৎ সত্যস্য পৃথগুপাদানং।"

অর্থাৎ সত্য সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ হন, সে কারণ মনু সত্যকে সকল ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া বলিয়াছেন। বিশেষতঃ "সত্যযুগ" নামের দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, কৃত যুগে সত্যের সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান ছিল, সে কারণ তাহাকে সত্যযুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অতএব সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম যে সত্য, ইহা সমস্ত বেদ-পুরাণাদি গ্রন্থেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক সত্যের অনুষ্ঠান থাকিলে তাবৎ অধর্ম্ম প্রায় এককালে নির্ম্মূল হয়, দস্যুবৃত্তি, চৌর্য্য, ব্যভিচার, কৃতঘ্নতা, স্বাপ্যহরণ প্রভৃতি পাপ-কার্য্য সকল যখন মিথ্যা সহকারিত্ব ভিন্ন সম্পন্ন হইবার উপায় নাই, তখন একমাত্র সত্যের প্রভাব বিস্তৃত হইলে এই সকল মহা পাপের অনুষ্ঠান কখনই সম্ভবপর নহে। পুনশ্চ এক-মাত্র সত্য ভাষণের দ্বারা মানব মধ্যে কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না।

"যমো বৈবস্বতো দেবো যস্তবৈষ হৃদিস্থিতঃ।
তেন বেদ বিবাদস্তে মাগঙ্গাং মাকুরূন্ গমঃ॥"

(মনু সংহিতা)

অর্থাৎ সকলের নিয়মকর্ত্তা ও পাপের দণ্ড-দাতা প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মা, যিনি তোমার অন্তঃকরণে অন্তর্য্যামি রূপে বিরাজিত আছেন, মিথ্যাকথনে তাঁহার সহিত বিরোধের সম্ভাবনা; যেহেতু তিনি সত্য-স্বরূপ হন, মিথ্যা তাঁহার বিরোধী ধর্ম্ম হয়; অতএব সত্য কথনের দ্বারা তাঁহার তুষ্টি জন্মাইলে তুমি তাহাতে নিষ্পাপ হইবে; সুতরাং পাপ ক্ষয়ের জন্য গঙ্গা ও কুরু-ক্ষেত্র গমনের প্রয়োজন নাই।

শ্রুতি যখন পরমাত্মার স্বরূপ কথনের চেষ্টা করেন, তখন তিনি সত্যকেই প্রথমে পরমাত্মার বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, যথা—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" আর নামের দ্বারাও পরমাত্মার তিন প্রকার নির্দ্দেশ হয়, তাহার চরম প্রকার "সৎ" অর্থাৎ সত্য, যথা—

"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধ স্মৃত।"

(গীতাস্মৃতি)

এই সকল প্রমাণের দ্বারা সম্যক্ উপলব্ধি হয় যে, একমাত্র সত্য কথনেই সাক্ষাৎ ভগবানের আরাধনা করা হয়; সত্যের ন্যায় ধর্ম্মাচরণ এ জগতে দ্বিতীয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ—সত্যের দ্বারা ইন্দ্রিয়দমন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়শাসন করিতে বাসনা করিবেন, তাঁহাকে প্রথমতঃ—ইন্দ্রিয় কি, এবং ইন্দ্রিয়ের ভাব কি, তাহা জানা আবশ্যক; যেহেতু যাহাকে দমন করিতে হইবে, তাহার পরিচয় সম্যক্ অবগত না হইলে, শাসনের সম্ভব হইতে পারে না। অতএব অগ্রে ইন্দ্রিয়ের পরিচয় সম্যক্ প্রদান করা একান্ত আবশ্যক।

মনুষ্যের কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার, যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ; এই পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে চলন, গমন, গ্রহণ ইত্যাদি কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সেই নিমিত্ত ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার, যথা—শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু জিহ্বা ও ঘ্রাণ; এই পাঁচটী দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচ বিষয়ের জ্ঞান হয়, সেই জন্য ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। ইহার মধ্যে একমাত্র বাগেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য নয়টী ইন্দ্রিয়ের সহিত মানবে ও পশুতে অনেক তুল্যতা দৃষ্ট হয়। এখন ইহা বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য যে, উপরোক্ত দশটী বহিরিন্দ্রিয় সর্ব্বপ্রকারে অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের যে ধর্ম্ম, তাহার অধীন; অর্থাৎ অন্তঃকরণে যে ধর্ম্মভাব আছে, তাঁহার ইচ্ছায় ঐ দশটী বহিঃরিন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কারণ হইয়া থাকে। যদ্যপিও বহিরিন্দ্রিয় স্বীয় ইষ্টানিষ্টে এবং পরের বিঘ্ন ও উপকারের সাক্ষাৎ কারণ হয়, তথাপি উহার নিগ্রহে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ হয় না, একমাত্র অন্তঃরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহতেই উহার দমন হইয়া থাকে, কেন না, বহিরিন্দ্রিয় সর্ব্বপ্রকারে অন্তঃরিন্দ্রিয়ের অধীন হয়। তাহার প্রমাণ যথা,—কোন ব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধে রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া, গ্লানিবোধে যদি সে লোভের দমন করিতে পারে, তবেই চৌর্য্যকর্ম্ম হইতে তাহার হস্ত নিবৃত্ত হইয়া থাকে; অন্যথা মনের গ্লানিপূর্ব্বক লোভের দমন করিতে না পারিলে, কেবল হস্তে আঘাত করিলে চৌর্য্য হইতে হস্ত কখনও নিবৃত্ত হয় না। সেইরূপ বাক্‌পাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় ও শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল অন্তঃরিন্দ্রিয়ের দমন ব্যতিরেকে কদাপি দম্য হয় না।

অন্তঃরিন্দ্রিয়ের দুই প্রকার ধর্ম্ম। প্রথম—অনিষ্টকারী; যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা গর্ব্ব, কার্পণ্য ইত্যাদি। দ্বিতীয়—ইষ্টকারী; যেমন লজ্জা, ক্ষমা, সন্তোষ, দয়া, নম্রতা, দিৎসা ইত্যাদি। এই দুই প্রকার ধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের সর্ব্বদা বিরোধী হইয়া থাকে; এবং এই বিরোধী ধর্ম্মের পরস্পরের যুদ্ধে যখন কামক্রোধাদি প্রবল হয়, তখন হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়

ও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ঐ সকল বলবৎ কাম-ক্রোধাদির অধীন হইয়া অনিষ্ট এবং উপদ্রব জন্মায়। সেইরূপ তাহার বিপরীতে উহাদের নিত্যযুদ্ধে যখন লজ্জা, ক্ষমা প্রভৃতি গুণসকল কাম-ক্রোধাদিকে পরাজিত করে, তখন বহিঃ-রিন্দ্রিয় সকল ঐ বলবৎ লজ্জা-ক্ষমাদির বশীভূত হইয়া অনিষ্ট, উপদ্রব জন্মায় না। তাহার প্রমাণ এই—ক্রোধ উপস্থিত হইলে ক্ষমা যদি তাহাকে পরাজিত করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ ক্রোধ বলবান্ হইয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আপনার বশে আনয়ন করতঃ তাহার দ্বারা যশ, মান, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত নাশের কারণ হয়। এইরূপ কাম-ক্রোধ-হিংসাদিও ঐ একরূপ ভাব হইয়া থাকে।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"
(গীতাস্মৃতি)

যে ব্যক্তি বাহিরে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে সংযত করে, অথচ মনেতে শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়কে চিন্তন করতঃ অবস্থিতি করে, সেই মলিনান্তঃকরণ ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী কহে। যেহেতু তাহার ইন্দ্রিয়দমন হয় না। ইন্দ্রিয়দমন ভিন্ন সত্যবাদী হওয়াও সম্ভব নহে। সত্যবাদী হইলে, এক-মাত্র সত্যকে অবলম্বন করিলে, দর্পাদি দোষ রহিত হইয়া বিমলান্তঃকরণ হয় এবং একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিলে, সতত ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া অন্তে সেই পরব্রহ্মে মিলিত হইয়া থাকে।

শ্রীরোহিণীকুমার চক্রবর্ত্তী।

অবসান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দ্বার দেশে লক্ষ্মণ ও দুর্ব্বাসা।

লক্ষ্মণ। প্রণতঃ*

দুর্ব্বাসা। এস বৎস, অভিলাষ পূর্ণ হ'ক তব—
তুমিই কি আজ প্রহরী এ দ্বারদেশে,

লক্ষ্মণ। হাঁ্যা প্রভো, আদেশ তাই
ক'রেছেন রাম!
তাই দ্বার রক্ষিতেছি সাবধানে।

(স্বগতঃ) কি জ্বলন্ত মূরতি ঋষির
শরীর দগধে যেন
অগ্নি কণা ছুটিছে নয়ন পথে
চাহি মুখ পানে, ভয় জাগে প্রাণে,
উত্তরিতে বচন না সরে মুখে
কণ্ঠ যেন অবরুদ্ধ হয়।

দুর্ব্বাসা। বীর গর্ব্বে সুমিত্রা-নন্দন,
উপহাস কর কি ব্রাহ্মণে
অবরুদ্ধ করি কণ্ঠ স্বর,
উত্তর না দিতেছ কিবা লাগি?
জন্মি রঘুকুলে, রাজপুত্র হ'য়ে
বৃদ্ধ দ্বিজে উপহাস সাজে কি তোমার?
দুর্ব্বাসা আমার নাম
অবজ্ঞা আমার প্রতি?

লক্ষ্মণ। যম দণ্ড পড়ে যেন শিরে,
হৃদয়ের দ্বারে শত বজ্র করিছে আঘাত
বিদীর্ণ কি হইবে এখনি?
নহে সুমঙ্গল, ঋষি ধরে ছল
ক্রোধানল এখনি উঠিবে জ্বলি

কি যে বলি বাক্য নাহি আসে মুখে।
(প্রকাশ্যে) ঋষি রাজ অনুগত দাস আমি,
কিবা সাধ্য অবজ্ঞা প্রকাশি
জানি না কি লাগি কণ্ঠ মম অবরুদ্ধ হয়
অবজ্ঞার নয় এ সম্ভাষণ,
জন্ম যার রঘুরাজ-কুলে
অবহেলে সে কি কভু দেবতা ব্রাহ্মণে।
দুর্ব্বাসা। পরিহাস কারে বলে আর ?
করি ঋষি দরশন, বল কোন জন,
করে রোদনের ভাণ ?
অনুমান নিষ্ফল নহেক মোর,
করি নিরীক্ষণ,
দীর্ঘ শ্মশ্রু শোভিত বদন,
হে লক্ষণ, রোদন আসে কি তব ?
কিবা বৃথা দোষী তোমা
অভিমান, ক্রোধ, অহঙ্কার,
সদা সম্পদের অনুগামী
দুর্ব্বল মানব মতি সদা সম্পদ লভিয়া
স্থির কভু রহিবারে পারে ?
সংসারে মানব সেই জন
ধনে গর্ব্ব নাহি করে যেই।
ক্ষণ। (স্বগতঃ) করে হৃদে শত শত
বৃশ্চিক দংশন
কুবচন কি লাগি ঋষির মুখে
(প্রকাশ্যে) ঋষিরাজ ও পদ প্রসাদে
নাহি জানি সম্পদের অহঙ্কার।
নহে ইহা রঘু কুল রীতি
অন্তর্য্যামী তুমি গুণধাম,
জানতো অন্তর মম অন্তরে অন্তরে
তবে কিবা ত্বরে,
নিষ্ঠুর বচন তব মুখে ?
দুর্ব্বাসা। পুনঃ ছলে বিতণ্ডা বাধাও
কর তর্ক দুর্ব্বাসার সনে
চাও যদি নিজ সুমঙ্গল নিরবেতে
অবস্থান কর পাপ মতি ;
আজ্ঞা যাহা করিব এখন
নীরবে তা করহ পালন।
লক্ষণ। কি বিকট হুহুঙ্কার,
বসি শিরদেশে
যম দূত গরজিছে যেন,
(প্রকাশ্যে) কি আজ্ঞা করুণ এবে দাসে
সাধ্য হ'লে প্রাণপণে করিব পালন।
দুর্ব্বাসা। অসাধ্য নহেক তব
অতি তুচ্ছ আদেশ আমার
কহ মহারাজে
দুর্ব্বাসা সাক্ষাৎ মাগে আসি
নিদারুণ ক্ষুধার অনলে
দগ্ধ দেহ হতেছে আমার।
লক্ষণ। হায় প্রভো !
এ আদেশ কেমনে পালিব
অজ্ঞাত সন্ন্যাসী সহ নির্জ্জন কক্ষেতে
মহারাজ মন্ত্রণায় ব্রতী,
সবাকার নিষেধ প্রবেশ তথা,
যায় যদি কোন জন প্রাণ প্রিয়তম,
করিবেন বর্জ্জন তাহারে,
এই সত্যে বন্দী রঘুনাথ।
তাই সাবধানে রক্ষিতে কক্ষের দ্বার
প্রহরীর ভার,
অর্পিত হয়েছে মম প্রতি।
কর যোড়ে করি অনুযোগ,

মাগি দয়া বিনয় বচনে
এ আজ্ঞা পালনে আদেশ না কর মোরে।

দুর্ব্বাসা। দ্বিজ ভক্তি এই বুঝি দুরাচার
আতিথ্য সৎকার হেন ভাবে কর বুঝি
দুর্ব্বাসার আদেশ পালনে
অবজ্ঞা প্রকাশ পুনঃ
শুন—চাও যদি নিজ সুমঙ্গল
রক্ষিবারে চাও নিজ প্রাণ
থাকে ভয় ক্ষুধিত এ ব্রহ্ম কোপানলে
কর তবে অম্লান বদনে
আদেশ পালন মোর
নহে ঘোর অমঙ্গল
নিশ্চয় ঘটিবে তব
হয় যাও নৃপতি সদনে
কহ মম আগমন কথা
নহে ছাড় দ্বার অকুণ্ঠিত চিতে।

লক্ষণ। অকারণে কেন প্রভো ক্রোধের সঞ্চার
অপরাধ কি আছে আমার
কি ত্রুটী দাসের দেব ভক্তি প্রকাশিতে,
করিবারে কর্ত্তব্য পালন
রাজ আজ্ঞা জানাহু তোমারে,
তব সেবা পরিচর্য্যা পরম যতনে
যথা সাধ্য করিবে এ দাস।

দুর্ব্বাসা। অহো দুরাত্মন্
সূর্য্য বংশ ধ্বংশিতে করেছে সাধ ?
পরমাদ ঘটালি নিশ্চয়,
দুর্ব্বাসার অবজ্ঞা প্রকাশি
দেখ্ তোর কিবা প্রতিফল
যে অনল জ্বালিব অযোধ্যা মাঝে
দগ্ধ হবে সূর্য্য-বংশ সে ক্রোধ অনলে
শুধু সূর্য্য-বংশ কেন
সম্পর্কে তাহার, যেখানে যে আছে,
আর এই পাপ পূর্ণ অযোধ্যা নগরী
মিশিবে শ্মশান রেণু সনে
ত্রিভুবনে কার সাধ্য রক্ষিবাবে তোরে,
দুর্ব্বাসার ক্রোধানলে,
এখনও মঙ্গল যদি চাও
যাও তবে রামের সদনে,
কহ মম আগমন কথা
নহে মূঢ় পরিত্রাণ লভিতে নারিবি।
ত্রিপুরারী সহায় যদ্যপি
তবু রক্ষা নাহি দুর্ব্বাসার ক্রোধানলে।

লক্ষণ। এতক্ষণে বুঝিলাম হায় !
মা আমার কেন দিয়াছিলেন দেখা,
বিভিষীকা কেন বা দেখেছি বার বার,
কেমনেতে পশি এবে মন্ত্রণা ভবনে !
সত্য প্রিয় রঘুনাথ জানে জগজন,
সত্য পালনের হেতু
বর্জ্জিবেন নিশ্চয় দাসেরে।
রাম সঙ্গ হারা হয়ে এ পাপ পরাণ
রাখিতে নারিব আমি
তিলেকের তরে !
দিব প্রাণ সত্য বিনিময়ে
উভয় সঙ্কটে এবে পড়িনু বিষম
নিশ্চয় মরণ
যাই যদি আর্য্যের সম্মুখে !
নহে বংশ ধ্বংশ হয় ব্রহ্ম-কোপানলে,
কিন্তু হায় বংশ ধ্বংশ হবে কিবা লাগি
উঠে পড়ে বুদ্বুদ্ যেমন
তেমতি এ নশ্বর জীবন,

মুহূর্ত্তেকে হ'তে পারে লীন,
প্রাণহীন হ'তে পারে দেহ
সেই তুচ্ছ প্রাণ বিনিময়ে
বংশ রক্ষা করিতে নারিব!
প্রাণ দিলে সত্যের পালন,
প্রাণ দিলে বংশের রক্ষণ,
কিবা ফল সে প্রাণের মমতায়,
(দুর্ব্বাসার প্রতি)
ক্রোধানল শান্ত কর দেব
অপরাধ ক্ষমহ আমার
তোমার আদেশে রামের সঁকাশে
যাই ইচ্ছা করিতে জ্ঞাপন।
কৃপা করি কিছুক্ষণ তরে
অপেক্ষা করুন দ্বারদেশে।

দুর্ব্বাসা। এইত সুন্দর!
সুবুদ্ধির মত কহ কথা,
বল কোথা যেতে হবে, যাই
অপেক্ষা করিতে নারি আর
অগ্রসরি যাও রাম পাশে
কহ আসে মহর্ষি দুর্ব্বাসা
আমিও যেতেছি তব কিঞ্চিৎ পশ্চাতে
ক্ষুধানল জ্বলিছে প্রবল
ভস্মরাশি হয় যেন দেহ! (প্রস্থান।)

পটপতন।

ক্রমশঃ

শ্রীমদেন্দ্রমোহন ঠাকুর।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সাহিত্য-সম্মিলন।—এবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টমবার্ষিক অধিবেশন বর্দ্ধমান সহরে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দেশের বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই সমবেত হইয়া সভামণ্ডপ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী আর একা কোন কার্য্য করিতে চাহে না, কোন কাজ একা করিতে আর তাহাদের প্রবৃত্তি নাই, তাই তাহাদের মিলনেচ্ছা প্রবল হইয়া সমবেত শক্তিতে কার্য্য করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে। আমরা এতদিন মনে করিয়াছিলাম—বাঙ্গালার প্রাচীনতম, প্রাতঃস্মরণীয় রাজবংশের বংশধর বর্দ্ধমানাধিপতি বাহাদুর বোধ হয়, আমাদের পর হইয়া যাইলেন, বোধ হয়, তিনি দেশের সন্তান হইয়া কেবল বিদেশী-ভক্ত হইলেন—আমাদিগকে পর করিলেন। এখন দেখিতেছি—তাহা আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম, সে দিন সম্মিলন-সভায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া, তিনি যেরূপ উদারতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সরলতার পরিচয় দিয়াছেন—তাহাতে তাঁহাকে অশেষবিধ ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। দীনতা ও অমায়িকতা না থাকিলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উক্ত গুণমণ্ডিত হইয়া, বঙ্গবাণীর সেবায় রত হইয়াছেন। একাধারে বাণী ও কমলার বরপুত্র হইয়া মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের কমনীয়তা কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা সেদিনকার সভায় সকলেই

দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রমে নিমন্ত্রিত সাহিত্যিকগণের আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, আর মহারাজাধিরাজ বাহাদুর নিজ বংশোচিত উদারতাগুণে সকলকে সমানভাবে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন; তাই এবার সাহিত্য-সম্মিলনের বিরাট সভায় কোনপ্রকার ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় নাই। সভাধিবেশনে চারিটী বিভাগে বাঙ্গালার চারিজন খ্যাতনামা ধুরন্ধর সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় সাহিত্য-বিভাগে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহোদয় দর্শন-বিভাগে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহোদয় বিজ্ঞান-বিভাগে এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহোদয় ইতিহাস-বিভাগের সভাপতি হইয়াছিলেন। সাহিত্যের আসরেই জাকজমক বেশী, লোকসমাগমও বেশী হইয়াছিল। এখানে নানাবিধ প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছিল। মাননীয় নাটোরাধিপতি কর্ত্তৃক সুললিত ভাষায় লিখিত ও পঠিত প্রবন্ধটী বেশ চিত্তাকর্ষক ও মনোরম হইয়াছিল। সভায় অনেক প্রস্তাব উত্থাপিত ও সমর্থিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা-পাঠ্য নির্দ্ধারিত করা উচিত—এই প্রস্তাব এবং পঞ্জিকা-সংস্কার করার ব্যবস্থা—এই দুই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কাশীমবাজারের স্বনামধন্য বিদ্যোৎসাহী, ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ পঞ্জিকা-সংস্কারের মন্দিরাদি প্রস্তুত করিবার খরচ ব্যতীত মাসিক দুইশত টাকা সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সভায় যখন দেশের গণ্যমান্য রাজা-মহারাজা ও ধনীগণের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীগণের জন্য একটী ধনভাণ্ডার স্থাপিত করার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয় না কি? বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবী অধিকাংশ দরিদ্র, অন্নসংস্থান হীন; সাহিত্য-সেবায় জীবনপাত করিয়া পরিণামে তাহাদিগকে দারুণ অর্থাভাব ভোগ করিতে হয়। কয়েকজন প্রথিতনামা সরকারী বেতনভোগী সাহিত্যিক ভিন্ন সকলেরই পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল—তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য এবং অসহায় অবস্থায় তাঁহাদের ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য একটী ধনভাণ্ডার স্থাপিত হওয়া একান্ত উচিত। এইরূপ একটী সুমহৎ কার্য্যের ফলে অশেষ ধর্ম্ম সঞ্চয় এবং উদ্যোক্তাগণের একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ চিরতরে প্রথিত হইয়া, তাঁহাদের সাহিত্য-ধর্ম্মের বিজয় ঘোষণা করিবে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, আমাদের সাহিত্য-বন্ধু শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ি মহাশয় নাকি এ বিষয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাব যে সর্ব্বতোভাবে সমীচিন হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। এক্ষণে দেশের মহারথী সাহিত্যিক মহারাজা ও অন্যান্য স্বদেশভক্ত পণ্ডিতগণের অনুমোদিত হইলে, বাস্তবিক দেশের একটা ঘোর অভাব অপনোদিত হয় এবং অনেকেই প্রাণ খুলিয়া সাহিত্য-সেবায় প্রাণপাত করিতে পারে।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন।—বিগত চৈত্র মাসে বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাঁইথিয়া সহরে ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের তৃতীয়বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। নানাস্থান হইতে প্রায় ২০০ শত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণী মহাশয় ওজস্বিনী-ভাষায় সকলকে দেশের প্রাচীনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, দেশের প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। বিবাহে পণগ্রহণ যাহাতে রহিত হয়, তাহার জন্য তিনি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বিবাহে পণ গ্রহণে যে কিরূপ কুফল ফলিতে পারে, পণ্ডিত মহাশয় নিজ বহুদর্শিতাগুণে তন্ন তন্ন করিয়া সে সমস্ত দেখাইয়া দিয়াছিলেন। বরপণ-প্রথা শাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্য—অতএব ইহা রহিত করিতে হইবে—সভায় এই প্রস্তাব সমর্থিত হয়। পুষ্করিণী

খনন, গোপালন, জমিদারগণের নিকট হইতে গোচারণের নিষ্কর ভূমি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা, বর্ত্তমান চতুষ্পাঠী গুলির উন্নতি ও রক্ষাবিধান করা, হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষাদান, সকল ব্রাহ্মণগণকে সদাচারী, সন্ধ্যাবন্দনাদি পরায়ণ হইতে এবং সংযমী হইতে অনুরোধ করা হয়। ব্রাহ্মণগণের দোষেই যে সমাজ দূষিত হইতেছে—তাহারা যে আপনাদের কর্ত্তব্যপথ ভ্রষ্ট হইয়া দেশকে অধঃপতিত করিতেছে—ইহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আদর্শ খারাপ হইলে যে, সমস্ত পণ্ড হয়—তাহা কে না স্বীকার করিবে। ব্রাহ্মণ-সম্মিলনের কৃপায় দেশে হিন্দুর পূর্ব্বপ্রচলিত আশ্রমধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইলে যে, দেশে আবার সুবাতাস বহিবে, সকলে মানুষ হইতে শিখিবে—তাহাতে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। ব্রাহ্মণ কখনও কেবল আপনার জন্য কোন কাজ করেন না, নিজের স্বার্থ তাঁহাদের ছিল না, তাই তাঁহারা একদিন দেবতার সমকক্ষ হইতে পারিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতার শেষে সকলকে নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন, ত্যাগী ও কর্ম্মী হইয়া যাহাতে দেশের কাজ করিতে পারা যায়, ব্রাহ্মণ মাত্রকেই তাহার চেষ্টাকরা উচিত; পূর্ব্বকালের ব্রাহ্মণদের কার্য্য এইরূপ ভাবেই সমাহিত হইত, তাঁহারা নিজের নাম জাহির করিয়া সমাজে বাহবা পাইবার জন্য কোন কাজ করিতেন না। ইহাই তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম। যাহাতে হিন্দু-সমাজ ও ধর্ম্মের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে সকলকেই অনুরোধ করা হইয়াছিল। এবার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বাহাদুরের কৃপায় সভার কার্য্য বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

শিল্প-বিদ্যালয়।—আমরা শুনিয়া অতীব সুখী হইলাম যে, কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় বহরমপুরে এক শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। T. W. Petaval নামক একজন কর্ম্মী সাহেব তাহার তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই বিদ্যালয় আপাততঃ ১৫ জন ছাত্রকে তড়িৎবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা ও সূত্রধরের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। মহারাজা ছাত্রদিগকে থাকিবার বাড়ী দিয়াছেন। এক বৎসর পাঠ করিয়া বালকগণ অন্যস্থানে কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে।

মণিলাল কোম্পানীর নববর্ষোৎসব।—কলিকাতা ৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীটস্থ বিখ্যাত জুয়েলার্স "মণিলাল কোং" প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ নূতন ধরণের নববর্ষোৎসব করিয়া থাকেন। উক্ত কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন সু-সাহিত্যিক এবং তিনি প্রতিবৎসরই এইভাবে বাগ্দেবীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। রামপদ বাবুর জীবনে এইটী একটী স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান। উৎসবস্থল—ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর বিস্তৃত হল, অতি সুন্দরভাবে পুষ্প, পতাকা ও আলোক দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। সভাস্থলে রাজা, মহারাজা, উকিল, ব্যারিষ্টার, জজ, সম্পাদক, সাহিত্য-সেবী ও সহর মফঃস্বলবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

নাটোরাধিপতি মাননীয় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর এই সান্ধ্য-সম্মিলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভারম্ভ হইলে, উক্ত কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে বিনয় সহকারে তাঁহাদের শুভাগমন জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও অভ্যর্থনা করেন। "বঙ্গবাসী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার রচিত "অভ্যর্থনা-সঙ্গীত" গীত হয়। পাটনা কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় "প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার" সম্বন্ধে ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। রামপদবাবুর বিনয়নম্র ব্যবহারে আবাল-বৃদ্ধ সকলেই সমভাবে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।



তপোবনে ধ্রুব।

বিশ্ব-স্বপ্ন।

একদা স্বপন দেখিনু কেমন
শোন্‌লো সই!
সুপ্ত-কালের গুপ্ত কথন
তুহারে কই।
ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ আঁধার ঘোর
সে কি গভীর-গম্ভীর; নাহিক সোর।
বিচিত্র চরণ বিশ্ব ভ্রূণ
নিলীন তাহার মাঝারে ওই!
সূচীভেদ্য সেই আঁধার টুটে
আলোক গোলক বিকশি উঠে
সৌর জগৎ ঠিকরি ছুটে
যেমন করিয়া ফোটে লো খই।
বিন্দু বিন্দু বিন্দু অমিয়া ঝরা
ছুটিছে প্রবাহি জীবন-ধারা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভূলোক বেড়িয়া
(তোর) যেমন রসনা রাজিত ওই—
দেখিতে দেখিতে এহেন রঙ্গ
চকিতে তন্দ্রা হইল ভঙ্গ
(পুনঃ) দেখিনু স্বপনে এক পতঙ্গ
অপূর্ব্ব সে রঙ্গ শুনহ কই!
ক্ষুদ্র তাহার পুচ্ছ মূলে
(বৃহৎ) স্বচ্ছ গোলক উঠিছে ফুলে
বিচিত্র বৎ বিশ্ব জগৎ
তাহার মাঝারে ফুটিয়া ওই
যেতেছে মিলায়ে পুনঃ সে জগত
হতেছে মূরতি পূর্ব্বেরি মত
শুনিনু জলদ নির্ঘোষ বৎ
কে যেন কাহারে কহিছে—অই
আকাশ পাতাল ভাবিস কি ছাই
বুঝাতে প্রহেলি দেখানু তাহাই
নির্গুণ সগুণ দু-গুণ মিশ্রিত
কভু মায়া যুত কখনো নই।
আলোকের সাথে যেমতি ছায়া
আমাতে জড়িত তেমতি মায়া
একাঙ্গে পুরুষ প্রকৃতি জায়া
বিকশি তমসে বিলীন হই।
একদা স্বপন দেখিনু যেমন
শোনলো সই!

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

দেবপুর ইতিহাস।

শশিপাত্র।

(১)

কমতাবিহার বা কুচবিহার রাজ্যান্তর্গত "কান্তপুর বা গোসানীমারী," একটী ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। গিরিজাচণ্ডী এস্থানে কবচ মধ্যে মঠের ভিতরে অবস্থান করিতেছেন। আর্য্যবংশে মহারাজ ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রে অতুল-বিক্রমে সমর করিয়া, "নর-নারায়ণ" রূপ অর্জ্জুনের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। তাঁহার দাক্ষণ বাহুতে "অক্ষয়-চণ্ডিকা কবচ" আবদ্ধ ছিল। যুদ্ধাবসানে ভদ্বংশীয়গণ তাহা গ্রহণ করেন।

বঙ্গাব্দ ৮৩৭ শকে, অর্থাৎ ১৪৩০ খৃঃ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভুত কমতেশ্বর বা কান্তেশ্বর নামধেয়, ভবাণীর বর-পুত্র কমতাবিহারের রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়া তিনিই চণ্ডির স্বপ্নাদেশে, চণ্ডিকা কবচ নিজ-পুরমধ্যে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার নানাবিধ অর্চ্চনার প্রথা,অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ সময় হইতে এই অক্ষয় দেবীকবচ গোসানী চণ্ডিকা * নামে গোসানীমারিতে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রাগুক্ত মহারাজ কমতাবিহারের রাজ্য-শাসন এবং সুবিচারের নিমিত্ত বাহির প্রাঙ্গনে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি পাত্র-মিত্র সহ বসিতেন এবং বিচার কার্য্য করিতেন। এই সভা "পঞ্চপাত্র-সভা" নামে একটী মন্ত্রণাগার। এই মন্ত্রণাগারে পাঁচ জন সুযোগ্য অমাত্য দ্বারা রাজ্যের সুবিধান নিরূপিত হইত। এই মহামন্ত্রণাগারের পাঁচ পাত্রের মধ্যে শশিপাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমাত্য ছিল।

শশিপাত্র আর্য্য-জাতীয় (ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়) সন্তান। তাঁহার দুই বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠা পত্নী ইন্দ্রমণি এবং কনিষ্ঠা পত্নীর নাম তারাদেবী ছিল। জ্যেষ্ঠার কোন সন্তানাদি ছিল না। কনিষ্ঠা পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ মনোহর † এবং কনিষ্ঠ বাহুবল। মনোহরের কোন সন্তান ছিল কি না জানিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান বংশধরেরা বাহুবলেরই বংশধর। শশিপাত্রের বংশপর্য্যায় পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

শশিপাত্রের বাসস্থান পূর্ব্বে সিঙ্গীমারি নদীর নিকট জম্বুগ্রামে অবস্থিত ছিল। এই গ্রামে পুরুষ পরম্পরা ক্রমে তাঁহাদের বসতী ছিল। অলৌকিক প্রভাববলে কান্তেশ্বর যখন সমস্ত কমতাবিহার রাজ্যের অধিশ্বর হইলেন, সেই সময়ে শশিপাত্রের বংশ ও গুণ-গরিমার বিষয় অবগত হইয়া মহারাজ তাঁহাকে রাজ্যের দেওয়ান নির্ব্বাচন করেন।

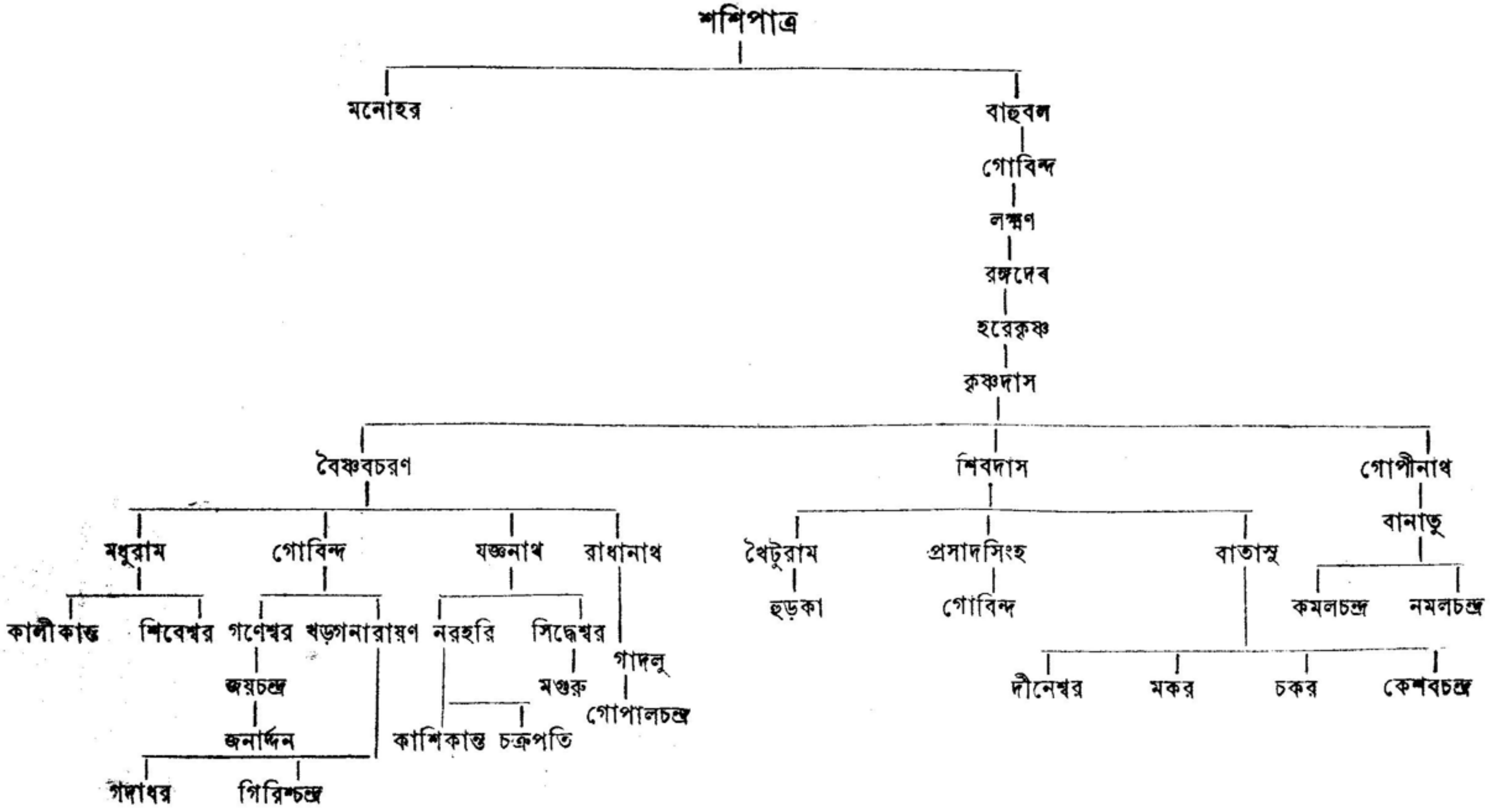
গোসানীমারির দক্ষিণে কিঞ্চিদ্দূরে শশি-

---

* ইহা একখানি পৌরাণিক হস্তলিখিত পুঁথি। ইহাতে এই বংশাবলীও প্রকটিত আছে। মহারাজ কান্তেশ্বরের ইতিবৃত্ত এবং চণ্ডির মাহাত্ম্যাদি ইহাতে বিশদ-ভাবে বর্ণিত আছে। এই পুঁথি ৺বৈষ্ণবচরণ বৈরাগীর রচিত একখানি কাব্য। ইহার কিয়দংশ "গোসানীমঙ্গল" নামে গোসানীমারী স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার মহাশয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন। ইহাতে ভণিতায় মতের পরিবর্ত্তে মজুমদারের মতই অত্যধিক।

† ইহার অদ্ভুত কালীউপাসনা ও কমতাধিপতির কন্যার পাণিগ্রহণ এবং দূত কর্তৃক লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ইত্যাদি বিষয় "মনোহর" প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

শশিপাত্রের বংশপর্য্যায়।



পাত্র একটী নূতন আওয়াস নির্ম্মাণ করেন। অত্রাওয়াসের পশ্চিমে অল্পদূরেই তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের শ্বশুরালয়। শশিপাত্র এই নূতন ভবন হইতে প্রত্যহ অক্লেশে পদব্রজে সভায় যাইতে পারিতেন। দেওয়ানের এই সাধের আওয়াসের পারিপাট্য বেশী দিন রহিল না। মহারাজ কান্তেশ্বরের অলৌকিক্ জীবন প্রদীপ নিষ্প্রভের সঙ্গে সঙ্গেই সে সৌন্দর্য্য রাশি ভস্মসাৎ হইয়া গেল। মন্ত্রীপুত্র 'মনোহর' রাজ-কন্যার প্রণয় লাভের প্রত্যাশায়, রাজান্তঃপুরে যাতায়াত করেন ইহা দেখিয়া দূতগণ তাহাকে লৌহডেরুতে আবদ্ধ করিয়া রাখে, এবং উত্তর-মশানে করালবদনী কালীকার নিকট তাহার বধের আজ্ঞা হয়। শশিপাত্র ইহা অবগত হইয়া, বাঙ্গলার সুবেদার মহম্মদআলির নিকট পুত্র-উদ্ধারের প্রার্থনা করায় ঢাকা হইতে কতক গুলি সৈন্য কমতাবিহারে আসিয়া, মহারাজ কান্তেশ্বরকে অন্যায় যুদ্ধে বন্দী করে; এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে বন্দী হইয়া মহারাজ অচিরেই প্রাণ-ত্যাগ করেন।

উক্ত সেনাদলের অধিনায়ক হোসেন শাহ আপন পুত্রকে কমতাবিহারে রাখিয়া যান। তিনি এই অবসরে কান্তপুরের প্রজাবর্গকে নানা-রূপ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ দুরাবস্থার সময় শশিপাত্রের পৌত্র গোবিন্দচরণ কর্ত্তৃক রঙ্গপুরের অন্তর্গত, পাঙ্গারের রাজগৃহ সংলগ্ন স্থানে একটী নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হয়; এবং তথায় মহারাজ কান্তেশ্বরের বংশধরগণ কিছুদিনের জন্য সুখস্বচ্ছন্দে বসবাস করিয়া আসিতেছিলেন। তৎপর বর্ত্তমান কুচবিহার রাজবংশের ঊর্দ্ধতন ১১শ সংখ্যক রাজা,—মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের সময়ে রাজ্যে এক ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হয়।

বাঙ্গালার সুবেদারের সেনাপতি সহসা ঢাকা হইতে সৈন্য সামন্ত লইয়া, ভূটান এবং কমতাবিহারের সমগ্র ভূখণ্ড আক্রমণ করেন। মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ ও ভোট-রাজ পরস্পর পরস্পরের সহায়তায়, মহম্মদালীর সেনাপতিকে পরাস্ত করেন। এই সময় হইতে ভোট-রাজের সহিত মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণের বন্ধুত্বভাব অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠে; কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। কিছুদিন পরেই মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন করি-লেন। তাঁহার একমাত্র নাবালক পুত্র—রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভোট-রাজার হস্তে অর্পণ করিয়া মহারাজ স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। ভোট-রাজ কমতাবিহারের নাবালক মহারাজার রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হইয়া, একজন প্রতি-নিধির হস্তে রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণভার অর্পণ করিয়া যান। ইতিমধ্যে বন্ধুপুত্র রাজা দেবেন্দ্র-নারায়ণের হত্যার লোমহর্ষণ সংবাদ ভোট-রাজের শ্রুতিগোচর হইল। ইহার পর ভোট-রাজের অনভিমতে মৃত মহারাজার জ্ঞাতি ভ্রাতা দেওয়ান দেবের তৃতীয় পুত্র ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন—ইহাও অব-গত হইলেন। ভোটরাজ তখন ক্ষোভে, দুঃখে অভিভূত হইয়া স্বীয় ভ্রাতপুত্র জীমিকে সেনা-পতি করিয়া সমস্ত কমতা-ভূভাগ অধিকার করিয়া লইলেন এবং মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র

নারায়ণকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

এই সময় সেনাপতি নাজির দেব ও রঙ্গদেব সিংহ, বন্দী মহারাজের উদ্ধারের জন্য ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব তৎকালিক ইংরাজ-রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বৃটিশ-গভর্ণমেণ্ট—"অর্দ্ধেক রাজস্ব গ্রহণ করিবেন," এই সর্ত্ত নিরূপিত হইয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর মিঃ জোন্সের নেতৃত্বাধীনে কমতা-বিহারে কতকগুলি সৈন্য প্রেরিত হয়। সেনাপতি রঙ্গদেব সিংহ এই যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ভুটিয়া সৈন্যগণকে পরাজিত করেন এবং বন্দী মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণকে মুক্ত করতঃ তাঁহার অশেষ প্রীতিরপাত্র হইয়া অবশেষে তাঁহার কন্যারত্ন লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণ পুনর্ব্বার কমতা-বিহারের রাজ-সিংহাসন লাভ করতঃ ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

শশিপাত্রের কথা বলিতে গিয়া কমতা-বিহারের রাজ-পরিবারের অনেক কথাই বলিলাম, যাহা হউক শশিপাত্রের নিম্নতন ৫ম পুরুষ, লক্ষ্মণসিংহের—রঙ্গদেব সিংহ প্রভৃতি সপ্তজন সন্তান ছিল। রঙ্গদেব জ্যেষ্ঠ, অতিরঙ্গ, প্রতুঙ্গ, অতুল, রাতুল, প্রতুল, শীতল প্রভৃতি ভ্রাতাগণ সকলেই কমতা-বিহারের সৈনিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। রঙ্গদেব সিংহ যে সময় ভুটানযুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতা ছয়জনও সৈনিক শ্রেণী-ভুক্ত থাকিয়া ভুটিয়া সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে রঙ্গদেব সিংহ সুস্থ শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতাগণ সেই যুদ্ধেই নিধনপ্রাপ্ত হন।

মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের দুহিতা সুভদ্রা দেবীর সহ ১২৭৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রঙ্গদেব সিংহের পরিণয় সম্পাদন হয়। এই বংশের মর্য্যাদা শশিপাত্রের মন্ত্রীত্বপদ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে কমতাবিহারের রাজন্যগণের নিকট সম্মানিত ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের রাজ-পদবী 'ঈশর', রাজকন্যা সুভদ্রা দেবীকে বিবাহ করার সময় হইতে শশিপাত্রের বংশধরগণ বংশের প্রধান গৌরব স্বরূপ ঐ 'ঈশর' পদবী লিখিয়া থাকেন।

রঙ্গদেব সিংহের একমাত্র পুত্র হরেকৃষ্ণ। ইনি তিনবার দারগ্রহণ করেন। জাহ্নবীপ্রিয়া প্রথমা, নারায়ণীপ্রিয়া দ্বিতীয়া এবং দুতীযাপ্রিয়া তৃতীয়া পত্নী ছিলেন। দুতীয়াপ্রিয়ার গর্ভে কৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস চারিবার দারগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরেকৃষ্ণের পত্নী দুতীয়াপ্রিয়া এবং কৃষ্ণদাসের সহধর্ম্মিণী 'আঁপুটী' ইঁহারা উভয়েই সহমরণে গমন করেন। ইঁহাদের সতীত্বকাহিনী জগতে অনন্তকালের জন্য জলন্ত অক্ষরে দীপ্তিমান রহিয়াছে।

কৃষ্ণদাসের ত্রয়বিংশ সন্তান ছিল। চারি পরিবারের মধ্যে ইঁহারা কাহার গর্ভে কে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। সন্তানগণের নাম এই—(১) বালকরাম, (২) বাতাসন, (৩) ঘনানন্দ, (৪) বলীনাথ, (৫) দিবোদাস, (৬) বাণসিংহ, (৭) সহোদেব, (৮) মিলনরাম, (৯) রামদাস, (১০) বিদ্যানন্দ, (১১)

বুদ্ধারন, (১২) জয়ানন্দ, (১৩) ভাদোল, (১৪) অযোধ্যাসিংহ, (১৫) মুল্লুকচাঁদ, (১৬) কাচুরায়, (১৭) জয়রাম, (১৮) বৈষ্ণবচরণ, (১৯) শিবদাস, (২০) তীতারাম, (২১) গোপীদাস, (২২) ব্রহ্মদাস (২৩) ভোঁরাম।

কৃষ্ণদাসের অষ্টাদশ সংখ্যক পুত্র বৈষ্ণবচরণ। ইনি পর্য্যায়ক্রমে পাঁচ বার দারগ্রহণ করেন। এই পঞ্চ পত্নীর ক্ষেত্রজা একাদশটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যাটীর নাম—রুক্মিণীদেবী। ইনি সর্ব্বগুণান্বিতা এবং গৌরবান্বিতা ছিলেন। কুচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রুক্মিণীদেবীর জগৎমুগ্ধা রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। মহারাজ ও রাজমহিষী উভয়েই ৺কাশীবাস করিয়াছিলেন। বং ১২৪৬ সালে মহারাজ কাশীতে শিবলোক প্রাপ্ত হয়েন। মহারাণী রুক্মিণীদেবী বিবাহের পর এবং কাশীবাসের পূর্ব্বেই শশিপাত্রের বংশাবলীর একখণ্ড লিপি তুলোট কাগজে লিখিয়াছিলেন। পরে তাহা বং ১২৯০ সালের ২৯শে চৈত্র তারিখে শশিপাত্রের বংশধরগণ দ্বারা পুনর্লিখিত হইয়াছে। উক্ত বংশাবলীর একখণ্ড নকল তদীয় বংশধর মাননীয় শ্রীযুক্ত শিবেশ্বর বর্ম্মা ঈশর মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শশিপাত্রের বর্ত্তমান বংশধরগণ 'পাঙ্গার' বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, কুচবিহার রাজ্যের মাথাভাঙ্গা মহকুমার পূর্ব্বখণ্ড নিশীগঞ্জ হাটের অদূরবর্ত্তী দক্ষিণে, সাতবেঁকী নদীতটে হাউসেরডারা নামক স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছিলেন, কিন্তু কিছুদিন হইল, ঐস্থান হইতে বাস্তবাটী পূর্ব্বদিকে হাড়িভাঙ্গা গ্রামে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। ক্রমশঃ।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মা সরকার।

নিদ্রিতা রমণী।

এত দিন সমাদরে রাখিয়াছি হৃদে ধ'রে
যতনে সোহাগে;
দুঃখময় ধরণীতে, ভয় হয় জাগাইতে
পাছে ব্যথা লাগে।
মুদিত আঁখির পাতা, না জানি কি মর্ম্মকথা
রয়েছে গোপন।
মুখখানি মাঝে মাঝে, যেন রাঙা হয় লাজে
কি দেখে স্বপন!
গত জন্মে বুঝি কারে, দিয়াছিলে বারে বারে
মরমে যাতনা।
তারি প্রেম-অভিশাপে, এ জনম তাই যাপে
কঠোর বেদনা॥
ইহা যদি সত্য হয়, জাগো দেবী ত্যজ ভয়
সে নহে প্রেমিক।
প্রণয়ী কাঁদিতে আসে, আঁখিজল ভালবাসে
চাহে না অধিক।
দেখ চেয়ে আঁখি মেলি, হেথাকার সত্যগুলি
কেমন ধরণী!
তোমার ও স্বপ্ন-পুরে, এরাই কি ঘুরে ফিরে
সব কি এমনি?
নিশিদিন দুইজনে, দেখা দেয় নিশিদিনে
আলো ও আঁধার?
হেথাকার মত সেথা, আছে কিগো মিশ্রিতা
গরল সুধার?

ফুটে ফুল ঝরে যায়, কেঁদে কি মলয় বায়
তোলে হাহাকার ?
কাঁদিয়া জানালে ব্যথা, বল দেবি কভু সেথা
হয় প্রতিকার !
হেথাকাব মত প্রাণে, বসন্ত কি নাহি আনে
নব জাগরণ।
ফুলের প্রফুল্ল হাস, কোকিলের কুহু ভাষ,
মত্ত সমীরণ ?
সেথাও উল্লাস রোল, শিশুর মধুব বোল
প্রেম-আলাপন ?
শ্মশানের চিতা-ধুমে, সহসা কি চির ঘুমে
হয় সমাপন ?
সেই প্রাণ ভিক্ষা মাগি, একবার উঠ জাগি'
বল দুটী কথা,
তারপর চিরতরে, লহ মোরে সাথি ক'রে
সাধিব না বৃথা॥

শ্রীরমানাথ পালিত।

তীর্থের ফল।

"দেখ তোমার পায়ে পড়ি, নিজের কাজ কর্ম্ম ফেলে অমন করে ঘুরে বেড়িও না। আমার কথা না শোন, মা—যিনি পেটে ধরে-ছেন, তাঁর কথা ঠেল কেমন করে বল দেখি ? মা'র চোখের জল পড়লে তোমার কি কখনও ভাল হবে ?"

"চুপ করে থাক, তোর আর গুরুগিরি করতে হবে না। আমি যাই করি না কেন, তোর বাবার কি ? এত বড় স্পর্দ্ধা, তুই কি না আমায় উপদেশ দিতে আসিস্ ? লজ্জা করে না ? তোর উপদেশ চায় কে ?"

"আমার কি ক্ষমতা, আমি তোমায় উপ-দেশ দেব কেন ? আমি ত তোমায় উপদেশ দিতে চাই না, আমি তোমার স্ত্রী, সহধর্ম্মিনী, তোমার ভাল মন্দেব দিকে লক্ষ্য রাখা কি আমার কর্ত্তব্য নয় ? আমি আমার জন্য ত তোমায় কিছু বলূচি না, তোমার ভালর জন্যই বলূচি। আমার কথা রাখ না রাখ, মা তোমার কাছে কি দোষ করেছেন ? তাঁকে কাঁদাও কেন বল দেখি ? তাঁর কথা শুনে চল্‌লেই ত তোমার সুসন্তানের মত কাজ করা হয়।"

"আমার যা প্রাণ চায় আমি তাই করব। আমি কারও কথা শুনতে চাই না। ভাল মন্দ বোঝবার আমার বয়স হয়েছে। তোর মত একটা কচি খুকির কাছে পরামর্শ নিয়ে আমায় কাজ করতে হবে নাকি ? আমায় যদি তোর ভাল না লাগে, এখানে থাকতে যদি তোর পছন্দ না হয়, তুই যেখানে খুসী চলে যেতে পারিস্। এখনও বলূছি ললিতা, মুখ সামলে কথা কইবি, না হলে তোকে আমি আজ সহজে ছাড়ব না।"

"যা বলূছি, আমি সত্যই বলূছি। আমি কি এমন দোষ ঘাট করেছি যে, মুখ সাম্‌লে কথা কইতে হবে ? দোষ করতে তুমি দোষ করবে, আর বলতে গেলে যা ইচ্ছে তাই বলে আমার বাপ মাকে পর্য্যন্ত অপমান করবে, কেন বল দেখি ? তুমি আমায় যা খুসী বল, লাথি মার, জুতো মার, সইতে পারি। কিন্তু আমার মা বাপ কি অপরাধ করেছে যে তাদেরও তুমি দিন রাত খোয়ার করবে ?"

হিমাংশু আর রাগ সামলাইতে না পারিয়া ললিতাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। তাহার মস্তকের এক স্থান কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। জননী আনন্দময়ী তখন রান্না ঘরে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন। পুত্রের ভীষণ চীৎকারে চমকিত হইয়া দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পুত্রবধু ললিতা মেঝের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু হিমাংশুকে দেখিতে পাইলেন না, কারণ সে একটু আগে গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

অনেকক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর ললিতা একটু সুস্থ হইলে আনন্দময়ী তাহাকে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিলেন, এবং নিজে সমস্ত কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া পুত্রবধুকে বাতাস করিতে লাগিলেন। ঘটনাটা কি জিজ্ঞাসা করিবার কোনও প্রয়োজন বুঝিলেন না। কারণ হতভাগা সন্তান প্রায়ই এইরূপে ললিতাকে নির্য্যাতন করিত এবং আনন্দময়ী তাহাতে বাধা দিতে আসিলে তিনিও যথেষ্ট অপমানিত হইতেন। কিন্তু আজিকার ঘটনাটা একটু চরমে উঠিয়াছিল, এতটা বাড়াবাড়ি একদিনও হয় নাই।

আনন্দময়ীর ভয় হইল পাছে এই প্রকার নির্য্যাতনে কোনও সাংঘাতিক বিপদ আপদ ঘটে। সেই জন্য তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া ললিতাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। ললিতাও তাহাতে কোন প্রকার আপত্তি করিল না। স্বামীর উপর তাহার তখন একটা দারুণ অভিমান আসিয়াছিল।

২।৩ দিন পরে হিমাংশু বাটী আসিল। সে তাহার জননীর স্বভাব জানিত, আস্তে আস্তে চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিল; মনে ভাবিল মায়ের রাগ পড়িয়াছে কি না জানিয়া তবে মায়ের সহিত দেখা করিবে, কারণ এই প্রকারই সে বরাবর করিয়া আসিতেছিল। হিমাংশু গৃহে যাইয়া ললিতার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল, কিন্তু ললিতা আসিল না। বাটীতে দূর-সম্পর্কীয়া এক আত্মীয়া থাকিতেন, হিমাংশু তাকে পিশিমা বলিয়া ডাকিত। সেই পিশিমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিল যে ললিতা শ্বশুর বাটী ছাড়িয়া বাপের বাটী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে বড় ভীত হইল—বুঝিল যে তাহার মায়ের এ রাগ সহজে পড়িবে না।

সংসারের কাজ কর্ম্ম শেষ হইলে পর হিমাংশুর পিশিমা আনন্দময়ীকে পুত্রের আগমন সংবাদ জানাইলেন। আনন্দময়ী শুনিলেন মাত্র কোনও কথা কহিলেন না। তাঁহার মনে তখন যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতেছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার সবেমাত্র এই একটী সন্তান, আর হয় নাই। তাহার এই সমস্ত আচরণ দেখিয়া তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। নিজের গৃহে যাইয়া তাঁহার মৃত স্বামীর উদ্দেশে অনেক কাঁদিলেন। এই সন্তানের মুখ চেয়ে তাঁহারা দুজনে যে কত আকাশ কুসুম রচনা করিয়াছিলেন, কত আশায়, কত উৎসাহে বুক বাঁধিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। স্বামীর পবিত্র বংশে যে দুরপনেয় কলঙ্ক পড়িতেছে, বংশগত পবিত্র মান সম্ভ্রমের উপর যে একটা অপমান ও ঘৃণার আবর্জ্জনা চাপান হইতেছে, এই সকল ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সেই

ঘৃণা ও অপমানের মাঝখান দিয়া বর্ষার রৌদ্রের মত যে স্বচ্ছোজ্জ্বল পুত্রস্নেহ তাঁহার প্রাণের মাঝে উঁকি মারিতেছিল, তাহাও তিনি দমন করিতে পারিতেছিলেন না।

অনেক ভাবিয়া আনন্দময়ী পুত্রকে নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন,—"দেখ হিমাংশু! তোমার অত্যাচার সহের অতীত হইয়াছে, আমি তোমার সহিত বেশী কথা কহিতে চাহি না। এতদিন তোমায় ক্ষমা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজ তুমি যে কাজ করিয়াছ, তাহার জন্য ক্ষমা করিলে আমি ধর্ম্মতঃ অপরাধী হইব। আজ হইতে তুমি আমার ত্যজ্য পুত্র, এ বাটীতে আর তোমার স্থান নাই। যদি কখনও নিজের স্বভাব চরিত্র শোধরাইতে পার, তবে আবার আসিও। মনে থাকে যেন, এর চেয়ে বেশী শাস্তি আমি তোমায় দিতে পারিতাম। কিন্তু—যাক্ সে কথা। আরও এক কথা, মনে ভাবিও না যে, আবার আমি তোমায় পূর্ব্বেকার মত ক্ষমা করিব, তাহা কখন হইবে না।

পাষাণের মত নিশ্চল হইয়া হিমাংশুকুমার এই কথাগুলি শুনিল। আজিকার আজ্ঞা অবহেলা করিবার তাহার শক্তি ছিল না। কারণ সে ভাবে নাই যে এতটা ঘটিবে, এমন ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে এবং অবশেষে স্নেহেরই জয় হইয়াছে। কিন্তু হিমাংশু বুঝিল, এবার সে আর তাহার জননী আনন্দময়ীর ক্ষমা পাইবে না। ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া সে তাহার মায়ের মুখের দিকে চাহিল; আনন্দময়ীর মুখ তখন বিষাদ-গম্ভীর, ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর সংবদ্ধ। তাঁহার মাতৃস্নেহ তখন তাহার হৃদয়ের দ্বারে আসিয়া পুত্রের ক্ষমা ভিক্ষা মাগিতেছিল। আনন্দময়ী প্রতিক্ষণেই মনে করিতেছিলেন যে—"না কাজ নাই, হয়ত আর দেখিতে পাইব না; আমার কত আদরের ছেলে, আমার কত যত্নের ধন, আমার সাগর ছেঁচা মাণিক। কত ঠাকুরের পূজা দিয়া অনেক কষ্টে আমার বাছাকে কোলে পেয়েছি? হয়ত এবার সাবধান করিয়া দিলে আর সে এমন কাজ কখনও করিবে না, আর সে অবাধ্য হইবে না।" কিন্তু মুখে তাঁহার কোনও কথা বাহির হইতেছিল না। সন্তানের করুণ নয়ন দুটী মায়ের ক্ষমা পাইবার আশায় তাঁহারই মুখের পানে চাহিয়াছিল, কিন্তু ক্ষমা মিলিল না। আনন্দময়ী আর একটী কথা না কহিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পাছে স্নেহেরই জয় হয়, সেই জন্য তিনি আর অধিকক্ষণ পুত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেন না। হিমাংশু আর কোনও উপায় না দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে গৃহত্যাগ করিল।

এদিকে ললিতা পিতৃগৃহে যাইয়া সুস্থির হইতে পারিল না। স্বামীর প্রতি বড়ই নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছে ভাবিয়া সে শান্তি পাইতেছিল না। হলেই বা উচ্ছৃঙ্খল। তাহাতে তাহার কি? অমন করে স্বামীর মুখের উপর কথা বলা কি উচিত ছিল? এতদিন সহ্য করিয়া আসিয়াছে, সেদিন আর সহ্য করিতে পারিল না? হিমাংশুর শ্বশুর বাটী আসিবার পথও ললিতা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। বাটীতে আসিয়াই সে তাহার পিতামাতাকে স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারের কথা আদ্যোপান্ত বলিয়াছিল।

পিতা বলিয়াছিলেন—"মা, সে হতভাগ্যের কথা তুলিও না। মনে কর তোমার বিবাহ হয় নাই! অমন মাতাল জামাতা থাকা অপেক্ষা না থাকা ভাল। কিন্তু এখন ত আর ললিতার সে মন নাই। সে অপমান বোধ নাই। কিসে তাহার স্বামী মার্জ্জনা পায়, এই ভাবিয়া সে আকুল হইতে লাগিল। ললিতা তাহার শাশুড়ীকে বড় ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। সেই জন্য এই দারুণ বিপদে কি করিবে—ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিল।

বাটী হইতে বাহিরে আসিয়া হিমাংশু ভাবিল—"কি করা যায়।" তাহার সকলের অপেক্ষা রাগ হইল ললিতার উপর। সে যদি পড়িয়া গিয়া এমন রক্তগঙ্গা না হইত, তাহা হইলে আজ তাহার এ দুর্দ্দশা হইত না। এমন করিয়া সে আজ পথে বসিত না। ললিতার উপর এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সে শ্বশুর বাটী অভিমুখে গমন করিল।

ললিতার পিতা খুব পাকা লোক ছিলেন। জামাতার দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহার যথেষ্ট রাগও হইয়াছিল। পাছে এ বাটীতে আসিয়া আবার কন্যার উপর অত্যাচার করে, সেই জন্য তিনি বাটীর সমস্ত লোককে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন হিমাংশু আসিলে তাহাকে বাটী প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়।

বাহির বাটীতে একটা গোলমাল শুনিয়া সচকিতা ললিতা ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য ছাদে উঠিয়া দেখিল, তাহার পিতা তাহার স্বামীকে বলিতেছে—"বেরোও আমার বাড়ী থেকে।" হিমাংশু অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া যখন ফিরিয়া যায়, তখন একবার সে ছাদের দিকে চাহিল; ভয়—বাটীর আর কেহ তাহার এ অপমান দেখিয়াছে কি না। ললিতা তখন দু'হাত জোড় করিয়া একটা অব্যক্ত আগ্রহে হিমাংশুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছিল। চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। হিমাংশু এ দৃশ্যও দেখিল; বুঝিল—ললিতা তাহার এ অপমান দেখিয়াছে। সে সেই দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। তখন তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য মর্ম্মান্তিক অনুতাপ আসিয়াছিল।

আনন্দময়ীর বড় সাংঘাতিক পীড়া, বাঁচিবার আশা নাই। তাই ললিতা আজ শ্বশুর বাটী আসিয়াছে। আনন্দময়ীর অবস্থা দেখিয়া ললিতা আর স্থির থাকিতে পারিল না; সে অনেক দিন কাঁদে নাই; উচ্ছ্বসিত আবেগে সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তা'র যে সব যাইতে বসিয়াছে, মনে আশা ছিল—শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিলে সে আবার তাহার স্বামীর সহিত মিলিতে পারিবে। কিন্তু এখন যে তা'র সব যায়! তাহার একমাত্র অবলম্বন—জগদ্ধাত্রীর মত দয়াময়ী শ্বশ্রূঠাকুরাণী, যাঁর স্নেহের অন্ত নাই, যত্নের সীমা নাই, যাঁকে মা বলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়;—এমন শাশুড়ী আজ মৃত্যুশয্যায়। ললিতা আনন্দময়ীর পদতলে পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ভাঙা ভাঙা স্বরে বলিল—"কি করলে মা! আমায় ফেলে যেতে কি তোমার একটুও কষ্ট হবে না? মা! তুমিই যে আমার সব, তোমার মুখ চেয়ে আমি যে সব দুঃখ ভুলে থাকি মা।" আনন্দময়ীর চোখের জল বাঁধ

মানিল না। তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন—"কাঁদিস্ কেন মা! ভয় কি! আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তো হ'তে আমার সব বজায় হবে। তুই যে আমার ঘরের লক্ষ্মী মা। তোর অপমানেই ত এমন একটা বিপর্য্যয় ঘট্‌ল। না হলে এমনটা কি শুধু শুধু হয় মা? মা! তুই অমন করে কাঁদিস্‌নি, তোর চোখে জল দেখ্‌লে যে আমি মরতে পারব না মা?" প্রাণের আবেগে অনেকগুলা কথা বলিয়া পরিশ্রম জনিত অবসাদে আনন্দময়ী হাঁপাইতে লাগিলেন। বুকের ভিতরটা বেশী জোরে ধড়ফড় করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনবায় বলিলেন—"মা ললিতা! কই হিমাংশুর ত কোনও খবর পাওয়া গেল না? এত খোঁজ করিলাম, এত চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই ত কিছু হ'ল না মা? সে কি আস্‌বে না? আমার শেষ সময়েও কি তাকে একবার দেখ্‌তে পাব না? ওপাড়ার উপীন-দা, বল্‌লে—সে তাকে কাশীতে দেখে এসেছে? দশ বার দিন থেকে সারা কাশীটা ত বেহাইমশায় খুঁজে এলেন, কোথাও তার সন্ধান মিল্‌ল না? কিন্তু আমার মন বল্‌ছে সে একদিন আসবেই আসবে। তবে হতভাগিনী আমি, আমি বোধ হয় তা'কে দেখ্‌তে পাব না! তা'কে যে বড় নিষ্ঠুর হয়ে বিদায় দিয়েছি মা? ললিতার বুকখানা জ্বালা করিয়া উঠিল, গলিত সীসক আনিয়া কে যেন তাহার সমস্ত দেহে ছড়াইয়া দিল। সে আনন্দময়ীর পায়ের মাথা রাখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ললিতার প্রাণপাত শুশ্রূষায় আনন্দময়ী একটু সুস্থ হইলে ডাক্তারেরা তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। ললিতার অনুরোধে এবং আনন্দময়ীর ইচ্ছায় সকলে আজ দশবার দিন হইল কাশীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। ললিতার পিতামাতাও সঙ্গে আসিয়াছেন। কেননা আনন্দময়ীর আর তেমন কোনও অভিভাবক ছিল না। পীড়ার উপশম আশায় কাশীতে আসিয়া হিতে বিপরীত ঘটিল। দিনকতক যাইতে না যাইতেই এবার পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল; "ঐ আমার হিমাংশু। ঐ যে বাছার মুখখানি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে গেছে। ঐ যে আমার সোণার যাদু আমার কোলে আস্‌বার জন্য ছুটে আস্‌ছে। আয় বাপ আমার! অভাগিনী মা তোর—যেমন অনেক কষ্ট দিয়েছি, তেমনি কত কষ্ট পাচ্ছি, একবার দেখে যা। আয় বাপ আয়, আর তোকে বকিব না, আর তোকে তাড়িয়ে দেব না।" ললিতা সমস্ত দেখিত, সে মূকের মত চুপ করিয়া থাকিত, পাষাণের মত সমস্ত সহ্য করিত, কিছু বলিত না। তাহার যে বলিবার কিছুই ছিল না। সে যে নিজ হাতে তার সোণার সংসারে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে; তাহার বড় সাধের আশায় স্বহস্তে ছাই দিয়াছে, সে যদি স্বামীর প্রতি এরূপ রূঢ় না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, এতটা ঘটিত না। একদিনের একটা ভুলে সে জন্মের মত অকূলপাথারে ভাসিতে চলিয়াছে।

ঢেউয়ের পর ঢেউ লাগিয়া পাষাণও যেমন

ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, নানা দুশ্চিন্তায় ললিতাও সেইরূপ হ্রাস পাইতেছিল। তাহার পিতা তাহাকে অনেক ব্যয় করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, সে অল্প বয়সে অনেক শিখিয়াছিল, কেমন করিয়া একটা ভাঙ্গা সংসার জোড়া দিতে হয়, কেমন করিয়া প্রাণপাত ভক্তি ও সেবায় উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনা যায়, এই সমস্ত সে অনেক পুস্তকে পড়িয়াছিল; কিন্তু আজ তার সে শিক্ষা কোথায়? তাহার সেই জ্ঞানের অভিমান, ক্ষমতার গর্ব্ব, নিপুণতার কৌশল আজ কোথায়? এমন দুর্ঘটনাও ঘটিতে পারে, তাহা সে যে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

আনন্দময়ীর ক্রমে ক্রমে দিন ফুরাইয়া আসিতেছিল। বিকারের নেশায় কখনও বা অচেতন থাকিতেন, কখনও বা পাগলের মত নানারূপ প্রলাপ বকিতেন, কখনও বা শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিতেন। তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কেহ চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারিত না।

আজ দুই দিন হইল, আনন্দময়ী সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। ললিতা ও আর আর সকলে কাশীতেই আছে। কারণ, ললিতার ইচ্ছা এই স্থানেই থাকা হয়, বাটীতে যাইতে তাহার মন চাহিত না। সে প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিত এবং ৺বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া বাটী ফিরিত। সংসারের কোনও কাজকর্ম্ম তাহার পিতামাতা তাহাকে করিতে দিতেন না।

একদিন মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া ললিতা তাহার সঙ্গিনী অমলার সহিত ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতেছিল, পথিমধ্যে এক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সে চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। অমলাকে বলিল—"ভাই! আমার একটা কাজ করবি; কিন্তু কাহাকেও বলবি না বল?" অমলা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। ললিতা বলিল—"তুই ভাই একটু পা চালিয়ে গিয়ে ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরের আস্তানাটা কোথায় জেনে আস্‌তে পারিস? জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলিস্ যে—আমাদের বাটীতে আজ সন্ন্যাসী ভোজন করান হবে, সেইজন্য আপনাকে বল্‌তে এসেছি—যদি দয়া করে পায়ের ধূলা দেন। যদি রাজী হয় ত বাড়ীর ঠিকানাটা বলে দিয়ে সন্ধ্যার সময় আস্‌তে বলিস্।" অমলা অতিমাত্র বিস্মিত হইলেও কারণ জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তাহার ছিল না। সে ললিতাকে দেবীর মত ভক্তি করিত। তাহার আদেশ সে দৈববাণীর মত মাথা পাতিয়া বহন করিত।

ললিতার আর সমস্ত দিন কাটে না। দূরগামী আরোহী প্লাটফরমে আসিয়া ট্রেণ ফেল হইলে, পরবর্ত্তী গাড়ীর আশায় যেমন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, ললিতাও সেইরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কখন সন্ধ্যা হয়, কতক্ষণে তাহার স্বামীর চরণে ক্ষমা মাগিয়া লইয়া তাহাকে গৃহবাসী করে, এই সমস্ত ভাবিয়া সে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর অমলা আসিয়া খবর দিল যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়াছেন। ললিতা অত্যধিক আনন্দে আত্মহারা হইয়া সাগ্রহে অমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ভাই, আজ আমার

যে উপকার করলি, তার ঋণ আমি জন্মজন্মান্তরেও শোধ দিতে পারিব না।" অমলা কোনও কথা বলিল না। সে বুঝিতে পারিল না, ললিতার উদ্দেশ্য কি? সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিয়া সে যে একটা মহৎ কাজ করিয়াছে, তাহা সে ভাবিতে পারিতেছিল না। এই সামান্য কার্য্যের জন্য তাহার এই অপ্রত্যাশিত পুরস্কার লাভ, যাহা সে কখনও পাইবার আশা পর্য্যন্ত করে নাই, তাহাকে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় করিয়া দিল। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ললিতা মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিল—"দয়াময়! এতদিনে কি অভাগিনীর দুঃখ-গাথা তোমার কাণে পৌঁছিয়াছে! বিশ্বেশ্বর! কাঙ্গালিনীর প্রার্থনা তুমি কি আজ শুনতে পেয়েছ?" অমলা বলিল—"ভাই! সন্ন্যাসী যে অনেকক্ষণ বসে আছে, দর্শন করতে যাবে না?" ললিতার চমক ভাঙ্গিল, সে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া অমলার সহিত বাহির বাটীতে গমন করিল।

হঠাৎ সম্মুখে সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, সন্ন্যাসী ঠাকুরের নিকট যাইয়া ললিতাও সেইরূপ চমকিয়া উঠিল। তখন সে তাহার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল; দূর হইতে হিমাংশুর মত দেখিয়া যাহাকে সে আজ নিজের গৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া আসিয়াছে, সে ত তাহার স্বামী নয়! ললিতার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে পড়িয়া যাইবার ভয়ে অমলাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—"অমলা, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে যেতে বল।" অমলা এ কথারও অর্থ কিছু বুঝিতে পারিল না। যাহাকে এত আদর করিয়া লইয়া আসা হইল, তাহাকে আবার এরূপ ভাবে বিদায় দেওয়া কেন, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। কি করিয়া সে ললিতার প্রাণের কথা জানিবে? ললিতাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন—"আরে পাগ্‌লী, হামার কাছে তোর লজ্জা কিসের? হামি তেমন সন্ন্যাসী ঠাকুর না আছে।" ভণ্ড সন্ন্যাসী এই কথা বলিতে বলিতে দৌড়াইয়া আসিয়া ললিতার হাত ধরিল। ললিতা "মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এই লোমহর্ষণ কাণ্ড দেখিয়া অমলা লোক ডাকিতে ছুটিল।

ললিতার পিতামাতা ও আরও দু'চার জন লোক লইয়া অমলা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল,—ললিতা একপার্শ্বে ঘোম্‌টা টানিয়া বসিয়া আছে, অপর পার্শ্বে একজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট সন্ন্যাসী সেই নিমন্ত্রিত সন্ন্যাসীর বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। ললিতার পিতা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"এ কে, হিমাংশু?" তারপর ছুটিয়া ললিতার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে মা, ব্যাপার কি?"

শ্রীকুমুদগোপাল ভট্টাচার্য্য।

অনার্য্য ভর জাতি।

ভর দ্রাবিড়িয়ান জাতি মধ্যে গণ্য। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্ব্বাংশে ভরগণ বাস করে। ইহারা রাজভর, আরত ও ভর-পতোয়া নামে পরিচিত।

উৎপত্তি।

গোরক্ষপুরের ভরগণ কহে যে,তাহারা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব। ক্ষত্রিয় রাজা ভরদ্বাজের পুত্রগণ প্রাচীন রীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরাপান ও মাংস ভোজন করিতে লাগিলে—জাতিভ্রষ্ট হন। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও সন্তানগণ সুরহা, সুরৌলিতে বাস করেন এবং কোন উচ্চ-কুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়-দুহিতার পাণিগ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় কন্যার আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক নিহত ও ভূতযোনী প্রাপ্ত হন। ঐ ভূতগণ লোকের অনিষ্ট সাধন করিতে আরম্ভ করায় সকলে তাহার পূজা প্রদান করিতে লাগিল,তাহাতে ভূতের উপদ্রব নিবারিত হইল। যাহারা এই সকল ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বোক্ত আচার-ভ্রষ্ট ভরদ্বাজ পুত্রগণের সন্তান-সন্ততি।

একদা এই ভরগণ উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশের পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিত। আজি পর্য্যন্ত তাহাদিগের কীর্ত্তি-কলাপের ধ্বংশাবশেষ অনেক স্থানে বিদ্যমান আছে। সার চার্লস ইলিয়ট (Sir Charles Elliot) বলেন যে, অযোধ্যার ঐতিহাসিক যবনিকা পতিত হইলে অযোধ্যার দৃশ্য কেবল জনশূন্য নিবিড় অরণ্যময় ছিল; পরে ঐতিহাসিক যবনিকা উত্তোলিত হইলে সূর্য্য-বংশীয় রাজগণের রাজত্ব ও অযোধ্যা রাজধানীর দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পুনরায় যবনিকা পতিত হয়; পুনরায় যবনিকার তিরোধানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অযোধ্যা ধ্বংশ প্রাপ্ত, সূর্য্য-বংশীয় রাজগণ নির্ব্বাসিত এবং তাঁহাদিগের স্থান সমূহ অনার্য্য চেরো, ভর ও রাজ-পাশীগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। চেরোগণ পূর্ব্বাংশে, ভরগণ মধ্যভাগে, এবং রাজ-পাশীগণ পশ্চিমে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিয়া রাজত্ব করিতেছে।

একদিন আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া এই ভর, চেরো প্রভৃতি অসভ্য-জাতিগণ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। পরে সুযোগ পাইয়া, কনক সেনের রাজত্ব কালে, দলে দলে পর্ব্বত হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সূর্য্য-বংশীয়গণকে সুদুর গুজরাটে দূর করিয়া দেয় এবং আপনারা হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূভাগের উপর আধিপত্য স্থাপন করে।

অনেকের মতে ভরগণ সুলতানপুরের আদিম অধিবাসী। ইহারা খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ও সুরাপানে অতিশয় অভ্যস্ত। ইহারা আপনারা কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ভুক্ত নহে বলিয়া অপরে কোন ধর্ম্মের আলোচনা করিলেও তাহাদিগের উপর খড়্গহস্ত হইত। স্থানে স্থানে ইহাদিগের দুর্গাদি থাকিলেও ইহারা স্বভাবতঃ একস্থানে স্থায়ী ভাবে বাস করিত না; নিয়তই বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিত; কারণ, লুণ্ঠনাদি কার্য্য ইহাদিগের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। †

ইহারা যে একদিন রাজ্য শাসন করিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; অনেক প্রস্তরময় দুর্গ,কূপ, তড়াগ,বাঁধ ও ভূগর্ভস্থ গৃহাদি ইহাদিগের কীর্ত্তি বলিয়া উক্ত হয়। গাজীপুরের চিড়িয়া-কোট দুর্গ ভরদিগের কীর্ত্তি। ‡

* Chronicles of Unao, 27.
† Settlement Report, 87 sq.
‡ Cunninghum, Archaeological Survey, XXII, 107.

বস্তী ও গাজীপুর জেলায় অনেক ভর-প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন—আধুনিক বাহারাইচ নগরের নাম ভর নাম হইতে উৎপন্ন। বাহারাইচ ভরগণের অতি প্রাচীন বাসস্থান। এইস্থান হইতে তাহারা ক্রমশঃ দক্ষিণে ফয়জাবাদ ও সুলতানপুর পর্য্যন্ত আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করে। মির্জাপুর জেলার ভাদোহী ও বরহর পরগণাদ্বয়ের নামকরণ ভর নাম হইতে হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়।

ওল্ডহাম সাহেব বলেন যে, গাজীপুরের জহুণাবাদ ও লখনেশ্বরে দুইটী ভর-দুর্গ বর্ত্তমান আছে। কৌশিক রাজ-পুতগণ কর্ত্তৃক ভরগণ গোরক্ষপুর হইতে বিদূরীত হয়। বিন্ধ্যাচলের নিকট পম্পাপুরা ভরদিগের মির্জাপুর এলাকার রাজধানী ছিল। এইস্থানের ধ্বংশাবশেষ হইতে প্রস্তরময় ও শ্মশ্রুবিশিষ্ট এক প্রকার মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, অনেকে অনুমান করেন যে, এই সকল মূর্ত্তি ভরদিগের কীর্ত্তি। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত অযোধ্যা প্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পূর্ব্বাংশে স্থিত যে সকল গ্রাম ও নগরের শেষ ভাগে "পুর", "আবাদ" ও মৌ সংযুক্ত নহে, প্রায় সেই সমস্ত গ্রাম ও নগরের নাম ভরগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ভরগণ যে সকল জলাশয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া উক্ত হয় ঐ জলাশয় সমস্তই সূর্য্যবেদী বা পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। হিন্দুর জলাশয় সমূহ চন্দ্রবেদী বা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত।

* Buchanan, Eastern India, II, 379.

ইতিহাস।

বেনেট সাহেব (Mr. W. C. Benet) ফিরিস্তা গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, অযোধ্যার দক্ষিণাংশে ভরদিগের আধিপত্য ছিল। তিনি বলেন যে, বুণ্ডেলখণ্ডের অজয়গড় ও কলিঞ্জর হইতে দুই খানি খোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে খোদিত আছে যে, এক ব্যক্তি (নাম নাই) তাঁহার বংশের আদি পুরুষ, এবং অজয়গড় দুর্গ তাঁহার অধিকৃত ছিল। মালিক নামক ইঁহারই এক বংশধর (মাল্কির ভ্রাতা ডাল্কি) কনৌজের শেষ রাজা পরাজিত হইলে সমস্ত দোযাব জয় করেন। ফিরিস্তা গ্রন্থের উক্তি অনুসারে ১২৪৬ খৃঃ দিল্লীর অধিপতি নাসিরুদ্দীন মহম্মদ কর্ত্তৃক ডাল্কি ও মাল্কি পরাজিত ও ধ্বংশ প্রাপ্ত হন। এই ডাল্কি ও মাল্কির কালিঞ্জর ও করা নামক স্থানে রাজকীয় দুর্গ ছিল এবং মালব পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ইঁহাদিগের অধিকৃত ছিল। এই ভ্রাতৃদ্বয় ভর বংশীয়, অযোধ্যার দক্ষিণাংশ তাঁহাদিগের শাসনাধীন ছিল এবং ঘাঘরা (নদী) পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। জেনারল কনিংহামের মতে (General Cunningham) ডাল্কি ও মাল্কি ভর-বংশীয় নহে—উভয়েই বাঘেল রাজা; ডাল্কি ডালকেশ্বরের ও মাল্কি মালকেশ্বরের রাজা ছিলেন।

আহীর ও ভরগণ আজি পর্য্যন্ত বলরাজার পূজা করিয়া আসিতেছে। তাহারা কহে যে, বলরাজার পূজা করিলে কদাচ সর্পে দংশন করিবে না। রায় বেরেলী, বস্তী ও অযোধ্যার

* Archœological Survey, XXI, 105.

বলরাজার পূজা প্রচলিত আছে। বলরাজা উক্ত দুই ভর ভ্রাতার অন্যতর। এক ভ্রাতা ডালমৌ ও অপর ভ্রাতা রায়বেরেলীর অধীশ্বর এবং যৌনপুরের ইব্রাহিম সার্কীর সমসাময়িক ছিলেন। পরে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নিহত হন। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, অযোধ্যার পূর্ব্বাংশেও ভরগণের আধিপত্য ছিল। উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা-প্রদেশের জনসাধারণ চতুর্দ্দিকস্থ ভগ্ন দুর্গ, সুদুর বিস্তৃত ও স্তূপে পরিণত অট্টালিকা-সমূহ ও প্রাচীন জলাশয়াদি ভরদিগের কীর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করে, তবে তাহারা তৎসম্বন্ধে কোনপ্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারে না। তাহারা পুরুষপরম্পরায় যেরূপ শুনিয়া আসিতেছে—তাহাই ব্যক্ত করে। যদি ঐ সকল কীর্ত্তি ভরগণের না হইয়া অপর কোন জাতির হইত, তাহা হইলে জনসাধারণ সেই জাতিরই নাম লইত কিন্তু যখন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ সমূহ প্রদর্শন করিয়া ভরগণের নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, তখন ভরগণই ঐ সকল কীর্ত্তির সম্পাদক—অপর কোন জাতি নহে। ভরগণ কণৌজ রাজ্যের পতনসময়ে সাহাবুদ্দিন ঘোরীর ভারত আক্রমণের পর আজিমগড় ও গাজীপুর হইতে সেনগড়,মির্জাপুর ও এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহ হইতে গহারোয়ার ; গঙ্গার উত্তর তীরস্থিত ভাদোহী হইতে মোণা; আরও পশ্চিমে এলাহাবাদ হইতে বৈশ,সোণক তিসিয়ান,বিষেণ ও ননোয়ক ; ফয়জাবাদ ও পূর্ব্ব অযোধ্যা হইতে বৈশ, এবং গোরক্ষপুর হইতে কৌশিক রাজপুতগণ কর্ত্তৃক নিষ্কাসিত হয়। অনেকে বলেন যে, ভরগণ একস্থানে পুরুষানুক্রমে বা দীর্ঘকাল বাস করিতে ইচ্ছুক ছিল না, গ্রাম ও নগরাদি লুণ্ঠন করিতে অধিকতর প্রয়াসী ছিল এবং যাহাদিগের আকৃতি ও গঠন বিন্ধ্যাচল ও কৈমুর পাহাড়ের অনার্য্য ও অসভ্যগণের সদৃশ তাহারা কদাচ ঐ সকল কীর্ত্তি-সমূহের অধিকারী হইতে পারে না ; ইহার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, তাহারা অন্য কোন জাতি হইবে। হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে কোন্ জাতি ? তাহারা কি একেবারে সবংশে নির্ব্বংশ হইয়াছে ? সঙ্গে সঙ্গে নামও কি বিলুপ্ত হইয়াছে ? তদ্বংশীয় কি আজি একজন মাত্রও অবশিষ্ট নাই যে, পূর্ব্বপুরুষগণের সামান্য মাত্র পরিচয় প্রদান করিতেও সক্ষম হয় ? প্রস্তর, তাম্রলিপি, পর্ব্বতগাত্র বা তৎকালীক প্রচলিত মুদ্রাদি দেখিয়াও কি সে জাতির কোন তত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না ? প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত ইংরাজরাজ অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে কাতর নহেন। ঐ বিভাগে উচ্চপদস্থ বেতনভোগী অনেক মনস্বী রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন এবং সকলেরই ঐ সকল কার্য্যে সুযশ আছে। তাঁহারা অনেক অচিন্ত্যনীয় তথ্যের আবিষ্কার করিয়া প্রত্নতত্ত্ব জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন কিন্তু আজি পর্য্যন্ত ঐ নামহীন জাতির কোন তথ্যই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেন না ? যে কোনও জাতি হইলে তাহার নামও সকলে জানিত। কিন্তু যে জাতি ভর—অন্য কেহ নহে। সেই জন্য সকলে ভরগণেরই পরিচয় প্রদান করে।

শাখা বিভাগ।

ভরগণের প্রধান শাখা তিনটী ; ভররাজ,

কণৌজিয়া ও রাজভর, কিন্তু স্থানবিশেষে বিভিন্ন শাখার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;— কাশীতে হেলা; জৌনপুরে গোরিয়া; গাজীপুরে বল্পটেন্ট, চেলফোর, বোঙ্গিয়া, খরোয়ারী, খুটস্ত কিনোয়ার, কুণ্ডেল, মৌন, পাটৌন ও সরপোস; বেলিয়ায় চেলফোর, কুলবন্ত; ফয়জাবাদে ভগ্‌তা, গঙ্গোহা ও রাইদাস এবং বারাইচে পালোলবাঁশ। মির্জাপুরের ভরগণ ভর ভূঁইহার, রাজভর ও দুষাদ এই তিন শাখার নাম লয়। পাশীগণ কহে যে, ভর তাহাদিগের জাতির এক শাখা মাত্র কিন্তু ভরগণ ইহা একেবারেই অস্বীকার করে। ভূঁইহার ভরগণ কহে যে, তাহারা ভররাজবংশজ; ইহারা যজ্ঞপবীত ধারণ করে এবং সূর্য্যবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। অন্যান্য ভরগণ কহে যে, তাহারা কোন এক ভর রমণীর গর্ভজ। একসময়ে কোন গ্রামে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভরগণের হত্যাকাণ্ডের অভিনয় স্থল হইতে এই রমণী পলায়ন করে। দুষাদ ভরগণকে দুষাদেরা আপনাদিগের শাখাস্থ বলিয়া স্বীকার করে না বটে কিন্তু ভরগণ দুষাদদিগকে আপনাদিগের অন্যতম শাখাভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করে।

ইহারা পুরুষানুক্রমে যে যে বংশের সহিত পান ও ভোজন করিয়া আসিতেছে, সেই সকল বংশের সহিত বিবাহের আদান প্রদান করিয়া থাকে। আজিমগড়ে ভরগণ হিন্দুর অস্পৃশ্য এবং কেবল রাজভরগণ হিন্দু বলিয়া উক্ত হয়। আজিমগড়ের ভরগণ, ভর, রাজভর, বিয়ার, পতিওয়ান, বিন্দ ও জোঁকহা এই সপ্ত শাখায় বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে বিয়ার ও বিন্দ স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে গণ্য। আজিমগড়ে রাজভরের নাম 'পতৈৎ' ও সাধারণ ভরের নাম 'খুন্তৈৎ'। খুন্তৈৎগণ শূকর পালন করে; পতৈৎগণ শূকর-পালন নীচকর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করে। শূকর-পালকগণের পুত্র কন্যাগণের পরস্পর আদান প্রদান হইয়া থাকে; অপর ভরদিগের সহিত বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন হয় না। যদি কোন অনূঢ়া বালিকা স্বজাতীয় কোন ব্যক্তির সহিত ব্যভিচার দোষে দূষিতা হয়, তাহা হইলে জাতীয় সভা বালিকার পিতার নিকট হইতে অর্থদণ্ড গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রথমা স্ত্রীর জীবিতাবস্থায় অপর পত্নী গ্রহণ করিতে হইলে প্রথমা স্ত্রীর সম্মতি প্রয়োজন। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের জন্য প্রথমা স্ত্রী স্বামীকে অনুরোধ করে; কারণ সপত্নী আসিলে গৃহকার্য্যে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিবে। *

আজিমগড়ে ইহাদের বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই; তবে স্ত্রী—বন্ধ্যা, উন্মত্তা বা অনারোগ্য রোগাক্রান্তা হইলে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করে। সচরাচর দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রথমার সহোদরা বা নিকট-সম্পর্কীয়া হয়। উপপত্নী রক্ষার নিয়ম নাই।

ইহাদিগের জাতীয় সভার নাম পঞ্চায়ৎ। পঞ্চায়তের কর্ত্তা চৌধুরী; চৌধুরী পুরুষানুক্রমে ঐ পদমর্য্যাদা উপভোগ করে। বিবাহ বা জাতি সম্বন্ধে যে কোন অপরাধের বিচারভার পঞ্চায়তের উপর। অপর জাতীয়া রমণীর গর্ভজ সন্তান পিতার জাতিপ্রাপ্ত হইলেও অপর ভরগণের সহিত পান ভোজন বা বিবাহ করিতে

* History of Human marriage, 496.

সক্ষম হয় না। ইহাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে; বিধবা সাধারণতঃ বিপত্নীককে বিবাহ করিয়া থাকে।

বিবাহ।

'সগাই' প্রথায় বিধবা বিবাহ হইয়া থাকে। বিধবা-বিবাহকারী আপন বন্ধুগণের সহিত বিধবার গৃহে গমন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট কন্যা-পণ প্রদান করে; তৎপরে ডাল, ভাত ও শূকর মাংসে আপনাদিগের উদর পূর্ণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। বিধবা নবস্বামী দত্ত বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া পর দিবস নববধূ সাজিয়া নব-পতির সহিত তাহার গৃহে গমন করে। বিবাহকারী স্বজাতিগণকে ভোজ দিয়া বিধবার সহিত পতি-পত্নীরূপে বাস করে। বর যদি বিপত্নীক না হয়, তাহা হইলে বিশেষ বিবাহ-প্রণালীর অনুষ্ঠান করিতে হয়। পাত্রের সম্মুখে পাত্রী উপবেশন করে। উভয়ের মধ্যে একটী রৌপ্য-নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক রক্ষিত হয়; পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে পাত্র অঙ্গুরীয়ে সিন্দুর লেপিয়া পরিধান করে এবং যত দিবস জীবিত থাকিবে, কদাচ অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিবে না। আজিমগড়ে নবম বর্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া রীতি। কন্যার বয়োক্রম দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে 'রজস্বলী' কহে এবং কন্যার অভিভাবকগণ লোক-সমাজে আপনাদিগের মুখ প্রদর্শন করিতে লজ্জিত হয়। কন্যাপণ ২৷৷০ টাকা নগদ ও বধূর একখানি বস্ত্র। আজিমগড়ে কন্যাপণ নাই। বিবাহের পর বর বা বধূর কোন অঙ্গবৈকল্য প্রকাশিত হইলে পঞ্চায়তের অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক একে অপরকে পরিত্যাগ করিতে পারে। অপর কোন পুরুষের সহিত স্ত্রীর ব্যভিচার ঘটিলে স্ত্রী পরিত্যক্তা হয় কিন্তু দোষের বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। বিবাহের ঘটক পাত্রের মাতুল। সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে পাত্রীর পিতা পাত্রের গৃহে আগমন পূর্ব্বক পাত্রকে একটী টাকা প্রদান করে, পরে নির্দ্দিষ্ট দিবসে আত্মীয়-গণের সহিত 'জলপান' করিতে পুনরায় আগমন করে। এই দিবস 'পানি পিনেকা দিন' বলিয়া উক্ত হয়। অঙ্গনে চতুষ্কোণাকৃতি আলিপনা প্রদান করে; তন্মধ্যে ভাবী বর ও শ্বশুর উপ-বিষ্ট হয়; পাত্রীর পিতা ভাবী জামাতার ললাটে দধিমিশ্রিত পিটুলির তিলক প্রদান করে। তৎপরে কন্যাকর্ত্তা স্বীয় সমভিব্যহারী ব্যক্তিবর্গের সহিত অন্ন, শূকর ও ছাগমাংস ভক্ষণ এবং সুরাপান করিয়া থাকে। এই দিবস ব্রাহ্মণ বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া দেন। তৎ-পরে 'মাটমঙ্গরা' (মৃত্তিকা আনয়ন) উৎসব, বর ও কন্যার বাটীর অঙ্গনে বিবাহ-মণ্ডপ নির্ম্মাণ, মণ্ডপের মধ্যস্থলে হল, মুষল ও পেষণ যন্ত্র (যাঁতা) স্থাপন, কদলীপত্র প্রোথিত করণ, তৈল ও হরিদ্রা সহযোগে পাত্র ও পাত্রীর গাত্র মর্দ্দন, কুদৃষ্টি নিবারণার্থ পুরোহিত কর্ত্তৃক পাত্রের হস্তে রক্ষাবন্ধন এবং বিবাহ করিতে গমনোদ্যোগী পাত্রের বরণ প্রভৃতি প্রক্রিয়া-সমূহ ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পুরোহিত পাত্রের হস্তে যে রক্ষাবন্ধন করেন, তাহার মধ্যে আম্র-পাত্র, ক্ষুদ্র লৌহবলয় ও সর্ষপ থাকে। অগোয়ান দেব, পাঁচোপীর ও কুলবতী দেবীর নিকট শূকরশাবক বলি প্রদত্ত হয়। পাত্র, পাত্রীর

দ্বারদেশে আগমন করিলে পুরোহিত গৌরী ও গণেশের পূজা করেন। বর ও কন্যার বস্ত্রপ্রান্তদ্বয়ের একত্র সংযোগে গ্রন্থীবদ্ধ হইলে উভয়ে একত্র যোগে পঞ্চবার মণ্ডপমধ্যস্থ স্তম্ভ প্রদক্ষিণ করে। তৎপরে বাসর-গৃহে (কোহবর) গমন করিলে তথায় বধূর পিতৃস্বসা পাত্রের সহিত নানাপ্রকার কৌতুক রহস্য করিয়া থাকে।

জন্ম।

গর্ভাবস্থায় পরিবারস্থ কোন বৃদ্ধা রমণী একটী পয়সা ও একমুষ্টি শস্য দ্বারা গর্ভিনীর মস্তকের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া লয় এবং সুপ্রসব হইলে বির্ত্তিহা, গ্রাম্যদেবতা ডিঃ ও ফুলমতী দেবীর শূকর বলি দ্বারা পূজা কবিবে বলিয়া মাননা করিয়া থাকে। প্রসব হইলে চামাবিণ (চর্ম্মকার জাতীযা) ধাত্রী নাড়ী কর্ত্তন পূর্ব্বক প্রসব-গৃহেই পুঁতিয়া রাখে এবং তদুপরি অগ্নি জ্বালিয়া রাখে; অগ্নি অশৌচান্ত হওযা যাবৎ জ্বলিতে থাকে। ষষ্ঠ দিবসে ছটী (ষষ্ঠী) ধাত্রী বিদায়গ্রহণ করে এবং তাহার স্থান নাপিত-পত্নী আসিয়া অধিকার করে। দ্বাদশ দিবসে 'বারহী' উৎসব। নবকুমারের পিতা শূকর বলি ও সুরা দিয়া বির্ত্তিহার পূজা প্রদান করে। প্রসূতি ধৌত আতপ তণ্ডুল দ্বারা কূপ পূজা করে। দ্বাদশ দিবসে জন্মাশৌচ শেষ হয়। প্রসবের পর স্বামী ছয় মাস পর্য্যন্ত স্ত্রী-সহবাস করিবে না। *

মৃত্যু।

বিসূচিকা বা বসন্ত রোগে মৃত অথবা অবিবাহিত ব্যক্তির শব হয নদীতে নিক্ষেপ করে নতুবা পুঁতিয়া ফেলে। অপর শবের রীতিমত সৎকাব করিয়া থাকে। দশম দিবসে মৃত্যাশৌচান্ত হয়। অশৌচান্ত অবধি, জলাশয় তীরে কুশ পুঁতিয়া, দাহকারী প্রেতাত্মার আশ্রয় স্থান জ্ঞানে প্রতি দিবস ঐ কুশের উপর জল প্রদান করে এবং প্রেতাত্মার আহারার্থ কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্যও রাখিয়া দেয়। দশম দিবসে ক্ষৌরকর্ম্ম কবিয়া পিণ্ডদান করে এবং ব্রাহ্মণকে আমান্ন (সিদা) প্রদান করে। জ্ঞাতিগণ অন্ন ও শূকর মাংস ভোজন এবং সুবাপানে পরিতৃপ্ত হয়।

ধর্ম্ম।

ভরগণের উপাস্য দেবতা আগোন দেব, ফুলবতী ভবানী ও পাঁচোপীর এবং বানরুবীর আরাধ্য ভূত। জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন (কুযার) মাসে কুক্কুট ও মলিদা দিয়া পাঁচোপীরের পূজা দেয়। গমেব আটা গুড় বা চিনির সহিত মাখিযা রুটী প্রস্তুত করে, পরে ঐ রুটী কুটিয়া চূর্ণ হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইলেই মলিদা হইল। অন্যান্য দেবতাকে শূকর বা ছাগ ও সুরা প্রদান করিতে হয। গোরক্ষপুরে জাতীয় দেবতা কালিকা ও কাশীদাস বাবা। কাশীদাস বাবা দুষ্ট ভূত। দেওরিয়া তহশিলের জঙ্গলে ইহাঁর বেদী আছে। পূজকগণ জঙ্গলে গমন পূর্ব্বক দধি, দুগ্ধ, রুটী ও ভাত প্রদান করিয়া ইহাঁর অর্চ্চনা করিয়া থাকে। গৃহে বা ক্ষেত্রে কালিকার পূজা হয়। ক্ষেত্রস্থ শস্য কর্ত্তনকালীন ইহাঁর পূজার সময়; পূজার প্রিয় উপহার স্থূল শূকর শাবক। পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষগণের উপাসনা করে। এবং ফাগুয়া বা হোলী,

* Waster marck, History of Human marrige, 483, Sq.

দেওয়ালী (দীপন্বিতা অমাবস্যা), খীচাড়ী (পৌষ মাসের সংক্রান্তি), কাজলী ও তীজ (ভাদ্র মাসের তৃতীয়া) পর্ব্ব সকলও মান্য করিয়া থাকে। অশ্বত্থ বৃক্ষ বাসুদেবের আবাস স্থল; রমণীগণ অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিলে প্রণাম করে এবং অবগুণ্ঠন দ্বারা মুখাবৃত করিয়া চলিয়া যায়।

রীতিনীতি, আচার ও ব্যবহার।

ভররমণীগণ হস্তে উল্কী পরে। শূকর ও গর্দ্দভ যাত্রাকালে দর্শন করিলে যাত্রা শুভ বলিয়া বিবেচনা করে। স্ত্রীলোকগণ হাতে কাচের চুড়ী, গলায় পুঁতির মালা, কাণে করণ ফুল (কর্ণালঙ্কার) ও পাইরী (পায়জোড়) পায়ে পরিধান করে। পুরুষেরা মোহর গাঁথিয়া গলায় পরে। সন্তানগণের দুই নাম। পণ্ডিত যে নামকরণ করেন, সেই নাম সাধারণের নিকট পরিচিত হয়। ইহারা গঙ্গার নামে, পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া কিম্বা জলে দণ্ডায়মান হইয়া শপথ করে। কখনও কখনও বা 'রাম কিরিয়া', 'গঙ্গা মায়ী কিরিয়া', অথবা 'ভবানী কিরিয়া' বলিয়াও দিব্য করে। তন্ত্র, মন্ত্র ও ডাইন বিদ্যায় দৃঢ়বিশ্বাস কিন্তু আপনারা কখনও এই সকল বিদ্যা শিক্ষা করে না। 'নজর' লাগিলে ওঝা আনে। ইহারা গোহত্যা করে না। অস্পৃশ্য বলিয়া ধোবী, হেলা, ডোম বা ধরকার প্রভৃতি নীচ জাতিদিগকে স্পর্শ করে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠ শ্যালকের স্ত্রীকে স্পর্শ করা নিয়মবিরুদ্ধ। কদাচ স্ত্রীর নাম গ্রহণ করে না। ইহারা অধিক মাত্রায় সুরাপান করিয়া থাকে। ছাগ, মেষ, হরিণ মাংস ও মৎস্য ভক্ষণ করে। কুক্কুট মাংস ভোজন নিষিদ্ধ। পিতৃপক্ষের পঞ্চদশ দিবস পিতৃপুরুষের উপাসনা করিয়া থাকে এবং নিরামিষ ভোজন করে। ইহারা 'স্যালাম' শব্দ উচ্চারণ করিয়া পরস্পর পরস্পকে অভিবাদন করিয়া থাকে। বৈবাহিক হইলে 'রাম', 'রাম' কহিবে। স্ত্রীলোক পুরুষের কার্য্যের সাহায্যকারিণী। স্ত্রীলোকগণের প্রতি ইহাদিগের ব্যবহার মন্দ নহে। ব্রাহ্মণে পাক করিলে 'কাচ্চি' (দাল, ভাত, রুটী ইত্যাদি) ও 'পাক্কি' (পুরী, তরকারী ও মেঠাই ইত্যাদি) উভয় প্রকার খাদ্যই ভোজন করে। পাক্কি কেবল ছত্রী (ক্ষত্রিয়) ও হালোয়াই (ময়রা) প্রস্তুত করিলে অনায়াসে ভোজন করিবে।

জীবিকা।

সাধারণতঃ ইহারা শ্রমজীবী; অনেকে কৃষিজীবী। চুরী ও ডাকাইতি ইহাদিগের মধ্যে অনেকের উপজবিকা। মির্জাপুরের ভাদোহীবাসী ভরগণ সঙ্গতিপন্ন; কিন্তু প্রতিবাসীগণের কণ্টক স্বরূপ; শস্য কর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইলে পাছে ইহারা ক্ষেত্রস্থ শস্য লুণ্ঠন করিয়া লয়, এই জন্য উক্ত সময়ে ক্ষেত্রে রীতিমত প্রহরী নিযুক্ত করিতে হয়।

অযোধ্যা-প্রদেশ বাসী ভর।

ইহাদিগের আকৃতি কোরী, চামার প্রভৃতি নীচজাতীয় হিন্দুদিগের ন্যায়। থারুদিগের ন্যায় ইহাদিগের কৃষি-কর্ম্মে সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য দেখিতে পাওয়া যায়। বনে বনে ভ্রমণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে, কিন্তু একস্থানে বসতি করিয়া ভূমিকর্ষণ পূর্ব্বক শস্যাদি বপন

করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনাতিপাত করিবে না। ইহারা অতিশয় ভীরু ও সরল; কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিকারী—লক্ষ্য অব্যর্থ। হিন্দুদিগের ন্যায় নীলগাই হত্যা করে না বটে কিন্তু শূকর-মাংস ইহাদিগের প্রিয় খাদ্য। মহুয়া ও চাউল হইতে প্রস্তুত মদ্য অধিক মাত্রায় পান করে। ইহারা 'আমাই' সমীপে ছাগ ও নাগ দেবতা 'কারে' দেওর নিকটে কুক্কুট-শাবক বলি প্রদান করে। বাঁশপতী মায়ীর পূজা হিন্দুদিগের অনুকরণে করিয়া থাকে। পূজার পবিত্র উপকরণ শস্য ও ঘৃত এবং ভক্ষক ব্রাহ্মণ। বিবাহে কোন ব্রাহ্মণের মতামত জিজ্ঞাসা করে না। বিবাহ প্রাণালী কোরী ও চামাদিগের ন্যায়।*

শ্রীআশুতোষ তরফদার।

সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটী কথা। †

দেবীতমা সরস্বতী বাগ্বাদিনী। বাক্‌সাধনই তাঁর পূর্ণোপচারে পূজা। এখানে বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই।

সাধনার মূলে সংযম, সংযম বাহ্য-প্রলোভন হইতে নিবৃত্তি। বাহ্য-প্রলোভনে অনুরাগ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, অনুরাগের স্বভাবে পরিণতই অবনতি। সত্যের অভাবেই ছদ্মবেশ, ছদ্মবেশই বাহ্যাড়ম্বরের আবরণ। মিথ্যাজগতে 'মূর্ত্তি' মিলিতে পারে, কিন্তু দেবীর সন্তোষ ও আশীর্ব্বাদ অসম্ভব।

রজ্জুকে দূর হইতেই সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, নিকটে গেলে আর হয় না। ছদ্মবেশ যতদিন লোক-লোচনের অন্তরালে থাকে ততদিনই তার পূর্ণ আধিপত্য। সাহিত্য জগতে প্রতারণা ও লোক-চক্ষে ধূলি দিয়া আত্ম-পরিপোষণ বিবিধ আকার ধারণ করে, স্বার্থপরতা পদে পদে দৃষ্ট হয়।

ইহার ফল ভয়ানক। সমাজের ও জাতির উন্নতি-স্রোত সাহিত্যের উপর নির্ভর করে। ইহাতে যদি নিস্বার্থ-পরতা ও সততার আদর্শ না থাকে, তাহা হইলে ইহার উন্নতি হয় না। যাঁহাদের উপর এত বড় মনুষ্য-সমাজের চিন্তা-স্রোত নির্ভর করিতেছে, তাঁহারা যদি নিজেদের দায়িত্বের গুরুত্ব না বুঝিয়া, বা বুঝিয়াও তাহা উপেক্ষা করিয়া, লোক-সমাজের দোহাই দিয়া, কেবলমাত্র নিজ নিজ সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধিতে থাকেন, তবে তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের সেবা করেন না—আপন আপন ভিন্ন ভিন্ন বাসনার সেবা করেন মাত্র।

ভাবের ও চিন্তার কার্য্য-শক্তিতে পরিণতি খুব শীঘ্রই হয়। নিভৃত-কক্ষে সাহিত্যিকের নীরব ভাষা সমাজের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া, ইহার চিন্তা-স্রোত পরিচালিত করে—কাজে কাজেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য, সমাজ-প্রীতি না হইলে তাহা সুফল প্রসব করে না।

সাহিত্য—পাপের সংস্কারক, পুণ্যের উৎসাহদাতা, একতার আদর্শ স্থল।

সাহিত্যের শক্তি সত্য—অসত্য নয়। সাহিত্য

---

* Oudh Gazetteer, I, 341.

† "শিবপুর সাহিত্য-সংসদের" প্রথম অধিবেশনে পঠিত।

ও সত্য এক না হইলে, সাহিত্যে তেজ থাকে না,—একতা থাকে না, বিশৃঙ্খলা ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। সাহিত্য ও সত্য এক না হইলে সমাজের অনিষ্ট হয়, সাহিত্য ও সত্য এক ছিল বলিয়াই ভারতে ত্রিকাল-দর্শী ঋষিগণ মহাকাব্য সমূহের স্রষ্টা। সাহিত্যই তাঁহাদের অলোক-সামান্য তেজস্বিতার জ্বলন্ত সাক্ষ্য। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য-জাতির সাহিত্যের ভিত্তি 'ধর্ম্ম।' সাহিত্য যদি ইহকাল লইয়াই ব্যস্ত থাকে, তাহা হইলে ইহার বিশেষ পরিপুষ্টি হয় না। ধর্ম্ম শুধু ইহকাল লইয়া নয়। ধর্ম্মই সত্য।

দেহাত্ম-বাদ সাহিত্যের মূলমন্ত্র হইলে সাহিত্যে আশা ও শান্তি থাকে না। আশা ও শান্তি যে সাহিত্যে না থাকে তাহার উন্নতি হয় না। আশা ভাব জগতকে লইয়া থাকে, দৃশ্য জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের অনন্ত-ধারাতে সাহিত্যকে মিশায়। সাহিত্যে "বিভীষিকা", সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি করে।

সত্য চিরকাল সমান। সকলের ইহাতে অধিকার—ব্যক্তিবিশেষের নহে। সাহিত্যের ইতিহাস—জাতীয় ইতিহাস ; সত্যের আবিষ্কার কেবল তোমার আমার জন্য নহে।—ইহা মানব-মণ্ডলীর জন্য, ইহা সমগ্র ভূমণ্ডলের সম্পত্তি। এইরূপ সাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য. ইহার ভিত্তি-ধর্ম্ম—উচ্ছৃঙ্খলা নহে,—একতা—যথেচ্ছাচার নহে—ইহাতে বিভীষিকা নাই, আছে—বিশ্ব-প্রেম।

ভাষা মানুষের সাহিত্যের নহে, এই ভাষা-তেই সাহিত্যের সৃষ্টি, এই ভাষাকে সাহিত্য রক্ষা করে। "মানুষের ভাষা" অর্থে—কেবল-মাত্র তোমার আমার নয় ; রাম, শ্যাম যে ইচ্ছা একটা ভাষার সৃষ্টি বা "কাট ছাঁট" করিতে পারে না। ভাষার উন্নতি, স্থিতি ও বিকাশ—জাতীর উন্নতি স্থিতি ও বিকাশ। মহাসাগরের তোলপাড় কোন বিশিষ্ট স্থানব্যাপী যে সে বায়ুতে হয় না, আর এমন বায়ু কখনও বহে না—যাহাতে সমগ্র বিশাল বারিধি স্থানান্তরিত হইতে পারে। খৃষ্টান ধর্ম্ম সহস্রাধিক বৎসর ইউরোপে প্রবল হইলেও ইউরোপের প্রত্যেক সভ্যজাতির ভাষায় গ্রীস ও রোমের কঙ্কাল অন্তর্নিহিত আছে।

কেবল কথার-কথা ভাষাই সাহিত্য নয়, ভাষা শুধু কথাবার্ত্তা, মুখের কথা নয়। এই ভাষাই মানব-প্রকৃতির বাহ্য-প্রকাশ। ব্যক্তি লইয়াই সমাজ—আর জাতি সমাজ লইয়াই গঠিত, অতএব যাহা জাতির সাহিত্য তাহা সমাজের ও সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তির মজ্জায় মজ্জায় জড়িত। কাজে-কাজেই সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব—সাহিত্যের অবনতি, জাতীয় জীবনের অবনতির পরিচায়ক।

আমাদের নিজের ভাষার প্রকৃত উন্নতির চেষ্টা খুব কম। বাল্যকাল হইতে ইংরাজীভাষা মুখ্য-উদ্দেশ্য জ্ঞানে চর্চ্চা করি, নিজের "মাতৃ-ভাষার" সেবার চেষ্টাই করি না, সময় বিশেষে যদি চেষ্টাও করি অভ্যাসের দোষে তাঁকে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, বিদেশী সাজ পরাইয়া বসি ও নানাবিধ কৃত্রিমবন্ধনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলি। অনেক সময় ইংরাজী ভাষার সাহায্য বিনা অনেক শব্দের এমন কি অনেক বাক্যের অর্থাগম দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। জগতের আরও অনেক জিনিষের মত ভাষারও একটা ইতিহাস আছে

উন্নতি, অবনতির ক্রম আছে। শব্দের সুব্যবহার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অনেকের মত, সমাজে নূতন ভাব প্রণোদনের সঙ্গে সঙ্গে, রং বেরংয়ের শব্দ সৃষ্টি, ও শব্দ যোজনা এক পক্ষে ভালই, সবদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আগে নিজের ঘর গোছান চাই, ঘরে কি আছে জানিলাম না, বাহির হইতে "আমদানির" ভাগ বাড়াইলাম, ইহাতে সাহিত্যের ভিত্তি সেরূপ দৃঢ় না হইয়া শিথিল হয়। আর ভিত্তি যদি সুদৃঢ় না হয়, পতনের আশঙ্কা বেশী। ভাষার জাতিগত বিশিষ্টতা নষ্ট হইবার আশঙ্কা বেশী থাকে।

কাব্যে ও নাটকেই সাহিত্যের প্রধান বিকাশ হয়; কিন্তু আমাদের মধ্যে 'সৌখিন" কবিতার অপেক্ষাকৃত এত ছড়াছড়ি হইয়াছে যে পূর্ব্ব-পুরুষগণের অনেক সুগভীর তত্ত্ব আমাদের মধ্যে বিশেষ স্থান পাইতেছে না। ইংলণ্ডে সাহিত্যের উন্নতি কবি "টেনিসনের" পরে বিশেষ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। মাতৃভাষাকে আমরা এখন অধিকাংশ "গীতি কাব্যে" আবদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের তেজোময়ী উদ্দীপনা-শক্তি যখন মহাসাগরকে আশ্রয় করে, তখনই ইহার মন্থনে, অভিনব রত্নরাজী সমুত্থিত হয়, দেবভোগ্য সুধা আপনি ভাসিয়া উঠে—তখনই ইহার প্রশান্ত ও গম্ভীর কল্লোল, সমাজের ও জাতীয় জীবনের প্রাণে স্থায়ী ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়।

শ্রীনীলরতন বসু।

"প্রহ্লাদ।

তাজিয়া সোহাগ-অঙ্ক নিদ্রিতা মাতার,
যেদিন পঞ্চম বর্ষে হে শিশু সাধক
বিমাতার বিষ-বাক্যে জর্জ্জর হিয়ায়
বহি গুরু দুঃখভার, চলিলে একক
দুর্গম গহন পথে, তব স্তুতি-গানে
সেদিন কি দশদিক উঠে ছিল ভরি?
শ্রীহরির পাদ-পদ্ম সার করি প্রাণে,
কি গোপন স্বর্গ-সুধা আনিলে আহরি!
হে নির্ম্মল পুণ্যশ্লোক বালক প্রেমিক—
সার্থক সাধনা তব; টলিল যাহায়
আপনি গোলকনাথ, মোহান্ধ দাম্ভিক
অবনত ভক্তিভরে, লুটাইল পায়;
বৃন্দাবন চন্দ্রমার হে চারু চকোর!
স্মরণে উথলে তব, প্রেম-সিন্ধু মোর।

শ্রীগিরীজাকুমার বসু।

পতিব্রতা রাহিমা।

(মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)।

বিশ্বমাঝে সতী-ধর্ম্ম করিতে প্রচার,
পুণ্যবতী সতী রূপে জন্ম রাহিমার।

মিশর একটী অতি সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সুবিখ্যাত প্রাচীন দেশ। স্মরণাতীত কালে এই সুপ্রসিদ্ধ মিশর দেশে ইয়াকুবনবী নামক জনৈক সিদ্ধ-পুরুষ বাস করিতেন। ইঁহার ইউনক-আলোহেচ্ছালাম নামক এক পুত্র ছিলেন। সতী রাহিমা এই ইউনক-আলোহেচ্ছালামের প্রিয়তমা পৌত্রী। দুর্ভাগ্য-ক্রমে রাহিমার জনক-জননী তেমন ইতিহাস প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা লোক

ছিলেন না বলিয়া,এ সুদীর্ঘ কাল পরেও তাঁহাদের নাম সংগ্রহে সমর্থ হই নাই। সুগন্ধি গোলাপ যাহার উদ্যানেই প্রস্ফুটিত হউক না কেন, আপনার অনন্ত-রূপ ও অনুপম সৌরভের গৌরবে সে কুসুম বিশ্ব-সমাদৃত ; রাহিমা যাঁহার গৃহেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি রূপসী, বিদুষী ও সতী-কুল গরীয়সী বলিয়া সর্ব্বত্র মহীয়ান্ মহিলার উচ্চাসনে সমাসীন থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আধুনিক তুরস্ক সাম্রাজ্যে সৌরিয়া নামক একটী প্রসিদ্ধ নগর আছে। নগরটী মহাত্মা শ্যাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহার অপর নাম শ্যামনগর। তথায় আয়ুব নামক এক রূপ-গুণ ও বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পন্ন, সরল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ভগবদ্ভক্ত মহা-পুরুষ বাস করিতেন। সতী রাহিমা এই সাধু-পুরুষের পতিব্রতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ছিলেন।

মহাত্মা আয়ুব যোগরত যোগীর ন্যায় সর্ব্বদা ঈশ্বর-প্রেমে তন্ময় থাকিতেন। তাঁহার তন্ময়তা যখন বড় বেশী হইত—তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে যখন ভগবৎ-প্রেমের বাণ ডাকিত,প্রেম-ভক্তির অমৃত নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইত, তখন তিনি আহার-নিদ্রা সব ভুলিয়া বহির্জ্জগৎ ছাড়িয়া , মুক্তাত্মার ন্যায় কোন এক স্বর্গীয় সুখের আধ্যাত্ম-জগতে বিচরণ করিয়া প্রাণে বিপুল প্রীতি লাভ করিতেন। সাধকের ভাষায় ইহার নাম ভাব-সমাধি। ভগবদ্ভক্ত যোগী-সন্ন্যাসীরা, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি মহা-পুরুষেরা এবং তদ্গত প্রাণ ঈশ্বর-প্রেমিক জনকাদি গৃহস্থ-ঋষিরা এরূপ ভাব-সমাধির নিত্য অধিকারী ছিলেন। ঈশ্বর-প্রিয় হইয়াছিলেন বলিয়া মহাত্মা আয়ুব পয়গাম্বর নামে অভিহিত হইতেন।

কি জানি কেন, স্বর্গীয় দেব-পুরুষগণের মনে মহাত্মা আয়ুবের ভক্তি-পরীক্ষা বাসনা হইল। তাঁহাদের প্রার্থনায়—পরম-কারুণিক পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মহাযোগী মহাত্মা আয়ুবের মহা-পরীক্ষা আরম্ভ হইল। ঈশ্বরেচ্ছায় ক্রমে আয়ুবের দেবকুমার তুল্য পরম সুন্দর চারিটী পুত্র-রত্ন এবং দেববালা সদৃশ তিনটী কুসুম-পেলবা দুহিতা অকালে কালের করাল-গ্রাসে চলিয়া পড়িল। তাঁহার অসংখ্য পশুপাল নিয়তির কঠোর তাড়নায় মহামারীর বিশাল উদরে আত্মবিসর্জ্জন করিল। অতি মূল্যবান বাণিজ্য-সম্ভার পূর্ণ বাণিজ্য তরীগুলি অতল সাগর জলে ডুবিল, বহুসংখ্যক বাণিজ্যাগার ও মণি-মাণিক্য পূর্ণ ধন-ভাণ্ডার সব সর্ব্বভুক অগ্নি-দেবের কৃপায় ভস্মীভূত হইল, ভূসম্পদ সব বাকী রাজস্বের দায়ে নিলামে বিকাইয়া গেল। সময় বুঝিয়া পুরাতন দাস-দাসীরা পর্য্যন্ত সে অভিশপ্ত-পুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অতি অল্প কাল মধ্যে মহাধনী মহাত্মা আয়ুব সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সব ফুরাইল। স্বপ্ন-রাজ্যের ন্যায় তাঁহার মহা-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন অত্যুচ্চ হর্ম্ম্যরাজী মুহূর্ত্তে কোথায় উড়িয়া গেল। যথা-সর্ব্বস্ব হারাইয়া তিনি পথের কাঙ্গাল হইলেন।

তিনি সব হারাইলেন ; কিন্তু ভগবানের পবিত্র নাম হারাইলেন না ! বরং সর্ব্বস্ব হারা হইয়া একমাত্র তাঁহাকেই আকড়াইয়া ধরিলেন, দিবারাত্রি তাঁহার পবিত্র নাম জপ—তাঁহারই ধ্যান-ধারণায় সময়পাত করিয়া আপনার প্রাণে

আপনি প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। তিনি পার্থিব ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইয়াও অনন্ত স্বর্গীয় সম্পদ লাভের জন্য—সর্ব্বরত্নাধার শ্রীভগবানের রাতুল-পদে আশ্রয় গ্রহণের জন্য কায়-মন-প্রাণে অনন্ত প্রেম-সাগরে সাঁতারিয়া শ্রীভগবানের প্রেমের দরবারে আপনার প্রাণের প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তিনি ভক্তি-তদ্গত প্রাণে বলিতে লাগিলেন,—

"দীন আমি, ক্ষুদ্র আমি, অধম দুর্ব্বল,
চাহি নাথ, রাঙ্গাপদ পূজিতে কেবল।
চাহি না তোমারে প্রভু পেলে কিছু আর,
দাস বলি পদে রেখ প্রার্থনা আমার।"

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি আয়ূব পথের ভিখারী হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার প্রতি ভীষণ দেব-পরীক্ষার শেষ হইল না। অচিরেই তিনি ভীষণ মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ঘৃণিত ব্যাধি তাঁহাকে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিল। সর্ব্বাঙ্গে গভীর ক্ষত ও তন্মধ্যে কৃমি-কীট সকল কিল্‌বিল্‌ করিতে লাগিল। পঁচা ক্ষতের বিষম দুর্গন্ধে মক্ষিকাকুল নিয়ত তাঁহার শরীরে ও চতুষ্পার্শে ভন্‌ভন্‌ শব্দে উড়িয়া উড়িয়া যারপরনাই জ্বালাতন করিতে লাগিল। গাত্র-গন্ধে ক্রমে তাঁহার নিকট লোকের বাস করা অসম্ভব হইল। এ সময়ে একমাত্র পতিব্রতা পত্নী রাহিমা ব্যতীত তাঁহার অপর পত্নীত্রয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে যেস্থানে পারিলেন পলায়ন করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিলেন। এই বিষম সঙ্কটকালে আয়ূবের প্রাণসম প্রিয় শিষ্য-দ্বয়ও অশ্রুমোচন করিতে করিতে অনিচ্ছায় গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। মহাপুরুষের সব গেল; বাকী থাকিলেন, এক-মাত্র পতিব্রতা পত্নী রাহিমা।

এই বিষম বিপদকালে আয়ূবের হৃদয়হীন প্রতিবেশী সহরবাসিগণ রাহিমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ করিল। শত্রুভয়ে সতী রুগ্ন পতিসহ সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়িতা রাহিমা চলচ্ছক্তিবিহীন রুগ্ন স্বামীকে আপনার স্কন্ধে বহন করতঃ আশ্রয়-ভিক্ষার্থে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সতী, পতিকে লইয়া ক্রমে সাতটী গ্রাম পরিভ্রমণ করিলেন; কত গৃহস্থের নিকট কত কাঁদিলেন, কত কাকুতি-মিনতি করিলেন, কিন্তু কেহই গলিত, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মহাপুরুষকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইল না! অবস্থা বিশেষে মানুষ এমনই নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর ও হিংস্রজন্তুরও অধম হইয়া পড়ে। অগত্যা উপায়হীনা রাহিমা এক নির্জ্জন প্রান্তরে ঘনপল্লব পত্রাচ্ছাদিত এক বিশাল বৃক্ষ-তলে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সতীর প্রাণপণ যত্নে তথায় পতির জন্য এক পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইল। নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে এই অতিক্ষুদ্র নির্জ্জন অরণ্য-কুটীরই এখন সদা জন-কোলাহল মুখরিত মহানগরী নিবাসী, রাজ-ঐশ্বর্য্য-বিলাসী মহাত্মা আয়ূবের প্রিয় আবাসগৃহে পরিণত হইল। জীবন-যৌবন ও সুখ-সম্পদের উপর মানুষের অধিকার এমনই ক্ষণভঙ্গুর! আর আত্মবিস্মৃত মূঢ় মানব এই ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের মোহগর্ভে নিয়ত এমনই আত্মহারা!

সতী রাহিমা দুঃখিনী হইয়াও কিন্তু ভিখা-রিণী হইলেন না। তিনি পতির জন্য আশ্রয়ের স্থান ব্যতীত এ পর্য্যন্ত আর কাহারও নিকট

একটী কপর্দ্দকও প্রার্থনা করেন নাই। সতী জানিতেন,—

"চাওয়া কিছু অপরের মুখপানে চেয়ে,
না খেয়ে পরাণে মরা ভাল তার চেয়ে।"

সুতরাং তিনি পতির প্রাণরক্ষার জন্য এই বিষম সঙ্কটকালেও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন না। সতী—পতির গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য শ্রম-জীবির কঠোর কার্য্যে নিযুক্তা হইলেন। তিনি অতি প্রত্যুষে তৃণশয্যা ত্যাগ করিয়া, স্বামীর জন্য রন্ধন করতঃ তাঁহাব স্নানাহার প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করাইয়া পতির ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণে স্বীয় ক্ষুৎপিপাসার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিয়া যথাসময়ে লোকালয়ে গমন করতঃ শ্রম-জীবির কঠোর কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। দিনান্তে কার্য্যাবসানে কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া আবার স্বামীর সেবা-পরিচর্য্যা ও আহার্য্য প্রদানে তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিয়া আপনার মনে আপনি সতত প্রীত থাকিতেন।

দম্পতী সর্ব্বস্ব হারাইয়া বনবাসী হইয়াছেন। কিন্তু এত দুঃখ-যন্ত্রণায়ও ভগবানের প্রতি ভক্তি বিশ্বাসহীন হন্ নাই। বরং দুঃখ-দুর্গতির অতল-গর্ভে পতিত হইয়াও তাঁহারা তাঁহারই রাতুল পদে আত্ম-সমার্পণ করিয়া প্রাণে প্রীতি অনুভব করিতেছেন; নির্ভীক বীরের ন্যায় বিপদে অটল থাকিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সেই দুস্থ দম্পতী তাঁহারই পবিত্র নামে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দানে নিবিড় অরণ্য-পর্ণ-কুটীরেও স্বর্গবাস সুখানুভব করিতেছেন। ভক্ত সর্ব্বস্ব ছাড়িতে পারেন, কিন্তু ভগবানের প্রতি প্রীতি-ভক্তি হীন হইয়া এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারেন না। সম্পদে বিপদে তদ্গত-প্রাণতাই সাধকের সিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায়।

একদিন বহু যত্ন সত্বেও রাহিমার কার্য্য জুটিল না। তিনি উপায় বিহীন হইয়া বিষাদ-ম্লান বদনে পল্লী-সিমন্তিনীগণের দ্বারে দ্বারে কাজের জন্য ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার সকল যত্ন—সকল শ্রম পণ্ড হইল। অগত্যা অশ্রুমুখী সতী রিক্ত হস্তেই কুটীরে প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। তখন একজন সমৃদ্ধিশালিনী ইহুদি-মহিলা সতীর ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত সুদীর্ঘ কেশ-দামের অর্দ্ধাংশের বিনিময়ে তাঁহাকে একদিনের উপযোগী আহার্য্য প্রদানের অভিলাষ জানাই-লেন। সতী পতির প্রাণ-রক্ষার্থ রমণীর এ নিষ্ঠুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বিলাসিনী ধনবতী ইহুদি-রমণী আপনার উপকেশ নির্ম্মাণার্থ এক থালা অন্নের বিনিময়ে সতীর মস্তকের সম্মুখ-ভাগের সমস্ত কেশগুচ্ছ কাটিয়া লইলেন। তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে সামান্য কেশ মাত্র কৃষ্ণ-ভুজঙ্গ পুচ্ছের ন্যায় বিলম্বিত রহিল। মুহূর্ত্তে রূপবতী সতী শ্রীহীন হইয়া পড়িলেন। সহসা কে যেন ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রভাবে তাঁহার অপূর্ব্ব-রূপমাধুরী স্ববলে কাড়িয়া লইল, কিন্তু পতিব্রতা রাহিমার প্রাণে সে জন্য বিন্দু মাত্র দুঃখের সঞ্চারও হইল না। তিনি আপনার সামান্য কেশগুচ্ছের বিনিময়ে রুগ্ন পতির জন্য একদিনের পরিমিত খাদ্য সংগ্রহ করিতে পাইয়া-ছেন, ইহাই তাঁহার পরম সুখ—প্রাণের এক মাত্র শান্তি। তিনি অন্ন-থালা হস্তে লইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল বদনে আপনার কুটীর-ভবনে প্রতিগমন করিলেন।

সয়তান নামক জনৈক ঈশ্বর বিদ্বেষী পাপীষ্ঠ লোক পতিব্রতা সতী রাহিমাকে পাপের পিচ্ছিল ক্ষেত্রে—নরকের কুপথে টানিয়া লইবার জন্য বহুবার বহু প্রয়াস পাইয়াছে; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাই সতীর প্রতি সয়তানের বড় ক্রোধ; সুযোগ পাইলেই পাপীষ্ঠ তাঁহার ক্ষতি করিতে সদা প্রস্তত। ওদিকে সতী যখন পতির খাদ্য সংগ্রহের জন্য আপনার সুশোভন কেশগুচ্ছ কর্ত্তন করিয়া দিতেছিলেন, এদিকে ধৃষ্ট-বুদ্ধি সয়তান তখন সতীর পতির নিকট আসিয়া বলিল—"মহাশয়! আপনার স্ত্রী রাহিমা বিবি চৌর্য্যাপরাধে গৃহস্থ-ভবনে ধৃত হইয়াছেন; গৃহস্থেরা জন-সমাজে তাঁহাকে কলঙ্কিণী বলিয়া চিহ্নিত করিবার মানসে তাঁহার মস্তকের সম্মুখ-ভাগের কেশরাশি কাটিয়া লইয়া যারপর নাই হতশ্রী করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। ছিঃ মহাশয়, আপনি না পরম সাধু—মহা তাপস? আপনার সহধর্ম্মিণীর এই কাজ?—এই কি আপনার সাধুতা ও সন্ন্যাস ব্রত?—এই কি সাধু-সহবাসের অমৃতময় ফল?" এই বলিয়া সাধুর ছদ্মবেশ ধারী দুষ্ট সয়তান তথা হইতে প্রস্থান করিল।

পাপীষ্ঠের অভিষ্ট সিদ্ধি হইল। প্রাণাধিকা পতিব্রতা পত্নীর বিরুদ্ধে এরূপ দুরপণেয় কলঙ্ক-কাহিনী শ্রুত হইয়া অরুন্তুদ দুঃখে আয়ুবের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; অশ্রুপ্রবাহে তাঁহার বক্ষঃস্থল সিক্ত হইল। সয়তানের বাক্য কৌশল প্রভাবে ব্যাকুল মনঃ দুঃখে মুহূর্ত্তে তিনি বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হইয়া মহা ক্রোধে এক কঠিন শপথ বাক্য উচ্চারণ করিলেন। মহাপুরুষ ঈশ্বরের পবিত্রনাম গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"আমি শ্রীভগবানের কৃপায় রোগমুক্ত হইতে পারিলে, সেই পরস্বাপ-হরণকারিণীর পৃষ্ঠে সবলে শত কষাঘাত না করিয়া কখনই আর পাপীষ্ঠাকে স্বীয় পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিব না।"

এদিকে সয়তানের প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই মুসলমান চিকিৎসকের অপূর্ব্ব-বেশে এক দেব-পুরুষ আয়ুবের পর্ণ-কুটীরে উপনীত হইয়া মুহূর্ত্তে তাঁহাকে রোগমুক্ত করিয়া দিলেন। দৈবশক্তি প্রভাবে মহাপুরুষ অচিরে তাঁহার পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া পাইলেন। "প্রেমে পাষাণ গ'লে যায়।" এরূপ অভাবনীয় উপায়ে দৈব-শক্তিপ্রভাবে রোগমুক্ত হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির বাণ ডাকিল। তিনি ধূলায় পড়িয়া জয় ভগবান!" বলিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। সাধুর পবিত্র ভক্তি-অশ্রু প্রবাহে সে বিজন পর্ণ-কুটীরে ভগবৎ প্রীতিরূপ অমৃত নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইল। তখন মহাপুরুষ আয়ুব যোগনিরত যোগীর ন্যায় শ্রীভগবানের রাতুল পদ ধ্যানে নিরত হইলেন। তিনি দেখিলেন, বিশ্বময় ভগবান!—এত দিনে তাঁহার মহাসাধনা সিদ্ধি হইল।

মহাপুরুষের ভাব-সমাধির অবসান হইলে তিনি চিকিৎসকের চরণে লোটাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন। দেব-পুরুষ ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে হস্তে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—"বন্ধু! আর তোমার এরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে প্রয়োজন নাই। চিরমঙ্গলময় জগদীশ্বরই তোমাকে রোগ-মুক্ত করিয়াছেন; আমি কে?—আমি উপলক্ষ

মাত্র। তুমি তাঁহার নিকট চির-প্রণত—চির-কৃতজ্ঞ থাক, ইহাই আমার একমাত্র আশীর্ব্বাদ। এখন চল, আমরা গৃহের বাহিরে অনন্ত মুক্ত আকাশতলে মুক্তবাতাসে ঐ স্বচ্ছসলিলা নদীর তরিদেশে পরিভ্রমণ করি—তথায় সন্তরণশীল মৎস্য সমূহের ক্রীড়া কৌতুক দর্শনে নয়ন জুড়াই। বলিতে বলিতে দেব-পুরুষ মহাত্মা আবুবকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন।

এ দিকে সতী পতির জন্য অন্ন-থালা হস্তে লইয়া কুটীরে উপনীত হইলেন। শূন্য-গৃহ দর্শনে পতির প্রাণভয়ে সতীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। তিনি পতির চিন্তায় আত্মহারা হইলেন; মুহূর্ত্তে তাঁহার কোমল হৃদয়ে কে যেন ভীষণ শ্মশানের অনল জ্বালিয়া দিল। তিনি মনে করিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার চলচ্ছক্তিহীন রুগ্ন পতিকে নিশ্চয়ই ব্যাঘ্রাদি কোনও হিংস্র-জন্তুতে ভক্ষণ করিয়াছে। সতী কুটীরে কোনও শ্বাপদ-জন্তুর পদাঙ্ক কিংবা শোণিত চিহ্ন দর্শন করিতে না পাইয়া কুটীরের বাহির হইয়া বন, উপবন, তরুলতা সকল অন্বেষণ করিতে করিতে নিয়ত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বিহ্বলতা বশতঃ এক স্থানে শতবার অনুসন্ধান করিয়াও যখন পতির দর্শন পাইলেন না, তখন সতী উন্মাদিনীর ন্যায় বাপীতটে যাইয়া দেব-পুরুষ সহ পতির পূর্ব্বশ্রী দর্শনে মহা বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তের জন্য আত্ম-চক্ষুর প্রতি তাঁহার ঘোর অবিশ্বাস জন্মিল। তিনি মনে করিলেন, হয়ত পতি-চিন্তায় আমি বড়ই উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি—এখন আমার মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, আমি বোধশক্তিহীন উন্মাদিনী প্রায় হইয়া পড়িয়াছি; তাই মরুভূমে মরীচিকা দর্শন ভ্রমের ন্যায় আমি অন্য কাহাকেও হয়ত আমার স্বামী বলিয়া মনে করিতেছি। অন্যথা আমার মহাব্যাধিগ্রস্ত চলচ্ছক্তিহীন গলিতাঙ্গ স্বামী সহসা এরূপ গন্ধর্ব্ব বিনিন্দিত দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন কিরূপে? এত শীঘ্র কোন্ মহাশক্তি প্রভাবে কোন্ স্বর্গীয় মৃতসঞ্জীবনী সুধা পানে তিনি রোগমুক্ত হইয়া এমন সোণার কান্তি—এমন দিব্য দেহ লাভ করিলেন? ইহাও কি সম্ভব? মানুষ কি এমন অপূর্ব্ব ভাবে রোগমুক্ত হইয়া এত শীঘ্র এমন দেবোপম দেহশ্রী লাভ করিতে সমর্থ হয়? নিশ্চয় মতিভ্রান্ত বশতঃই আমি পরপুরুষকে স্বামী মনে করিয়া মহাপাতকিনী হইতেছি।" এই বলিয়া সেই অশ্রুমুখী সতী শোকে-দুঃখে অভিভূত হইয়া নদী-তীরে দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সতীর প্রতি ভগবৎকৃপারূপ অমৃত-নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইল। বৈদ্য-বেশধারী ছদ্মবেশী দেবপুরুষের কৃপায় পতি-পত্নীর পরিচয় হইল। মহাপুরুষের দৃষ্টি যখন সতীর ছিন্ন কেশরাশির উপর পতিত হইল, তখন পত্নীর চৌর্য্যাপরাধ সম্বন্ধে শয়তানের উক্তি স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহার প্রতি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইলেন। এবং স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ তাঁহার কুসুমপেলব পবিত্র অঙ্গে সবলে শত কষাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সেই দেবপুরুষ পতিব্রতা সতী রাহিমার দেবোপম সুচরিত্র, অসীম পতি-ভক্তি ও অলৌকিক ভগবৎপ্রেমের বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিয়া শয়তানের [illegible]

উক্তির অসারতা ও সতীর নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিলে মহাপুরুষ আপনার ভীষণ শপথের কথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইলেন। অনন্তর দেবপুরুষের আদেশ ও উপদেশে মহাত্মা আয়ুব পত্নীর পবিত্র দেহে শত যব-শুঁয়াগুচ্ছ প্রহার করিয়া স্বীয় পণ রক্ষা করিলেন। পতি-পত্নীর শুভ সম্মিলন হইল। দেবপুরুষ দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন। সতীর পতি-ভক্তি পরীক্ষা, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মপরীক্ষা শেষ হইল।

চিরমঙ্গলময় শ্রীভগবানের শুভ ইচ্ছায় তাঁহাদের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। মহাপ্রেমিক মহাধার্ম্মিক আয়ুব ও তাঁহার পুণ্য পবিত্রতাময়ী পতিব্রতা পত্নী রাহিমা ঐশ্বর্য্যে অনাসক্ত চিত্ত হইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল মনে নিয়ত শ্রীভগবানের রাতুল পদ ধ্যানে আপনাদের পুণ্যময় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যথাকালে তাঁহাদের প্রতি ভগবানের শুভ আহ্বান আসিয়া পঁহুছিল। স্বর্গের মণি-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। দেববালারা কুসুম-মালে সাদরে দম্পতীকে বরণ করিয়া লইলেন। পতি-পত্নী অনন্ত শান্তিপূর্ণ স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। দিগাঙ্গনাগণ হুলু-ধ্বনি করিয়া উঠিল। দম্পতির মাথার উপর মন্দার সঞ্চালিত পারিজাত রেণু সকল উড়িয়া পড়িতে আসিল। সহসা স্বর্গীয় মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সিদ্ধি আসিয়া সাধককে— মুক্তি আসিয়া ভক্তকে অনন্ত প্রেমের রাজ্যে লইয়া গেল।

শ্রীবরদাকান্ত কবিরত্ন।

রাজা নীলাম্বর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভয়ানক কথা!

রজনী অন্ধকার—মেঘে ঢাকা, আকাশে নক্ষত্র নাই—অতএব অন্ধকার আরও গাঢ় বোধ হইতেছে। রাত্রি এক প্রহর অতীত, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। মন্ত্রী শচীপাত্র নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া নিজের ও পুত্রের পরিণাম চিন্তা করিতেছেন। পুত্রটির জীবনের ত শেষ হইল, নিজেরই বা কি হইবে কে জানে? বৃদ্ধের অক্ষ নিদ্রা নাই, চিন্তায় মন বড়ই কাতর। এক একবার মনে হইতেছে—সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইবেন, একমাত্র পুত্র যখন থাকিল না, তখন আর সংসারে বৃথা ক্লেশ পাওয়া কেন? আবার প্রতিহিংসা-বৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠিতেছে। এই নির্ম্মম অহিন্দু রাজাই ত ব্রাহ্মণ-পুত্রের প্রাণবধ করিল! হায়, হায়! সে এমন কি অন্যায় কার্য্য করে ছিল? বৃদ্ধের অশ্রু মৃত্তিকায় গড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ তখন প্রতিহিংসার জন্য ব্যস্ত হইলেন। এত বড় ক্ষমতাশালী রাজার কিরূপে সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন অনেকক্ষণ পরে স্থির করিলেন—ইহার একমাত্র উপায় মুসলমানদিগের শরণাগত হওয়া।

বৃদ্ধ মন্ত্রী যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ দ্বার খুলিয়া একটী অবগুণ্ঠিতা রমণী গৃহপ্রবেশ করিল এবং কোনও বাক্যালাপ না করিয়া একখানি আসনে উপবেশন করিল, এবং নিজের অবগুণ্ঠন খুলিল। মন্ত্রী সবিস্ময়ে

দেখিলেন—একটী সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক। যুবতী ধীরস্বরে বলিল—"আমার পরিচয় এখন আপনার জানিবার প্রয়োজন নাই। আপনার পুত্র আমাকে চিনিত। আপনার পুত্রের জীবন-লীলা রাজার অনুগ্রহে শেষ হ'য়েছে, এখন কি করতে চান?"

মন্ত্রি সবিস্ময়ে এই সব কথা শুনিলেন, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। যুবতী বলিল—"আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পুত্র ব্রাহ্মণ, এই রাজ্যে ব্রহ্মবধ হয়েছে, আর মঙ্গল নাই। আপনি শেষ বয়সে একমাত্র প্রিয় পুত্রকে হারাইলেন। ইহার একমাত্র ঔষধ প্রতিহিংসা। প্রতিহিংসা নিলেই আপনার হৃদয়ের আগুন নিবে যাবে।" এই কথা বলিতে বলিতে যুবতীর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল, সে গম্ভীর স্বরে বলিল—"আপনি ভীত হইবেন না, সাহসে বুক বাঁধুন, কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিবেন না। যে ব্যক্তি আপনার পুত্রকে হত্যা করেছে তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা করুন।" মন্ত্রী ধীরে ধীরে বলিলেন—"আমার সাধ্য কি যে প্রতিহিংসা নিতে পারি?" যুবতী রোষ-কষায়িত-লোচনে বলিল—"তুমি মনুষ্য নামের অযোগ্য। গেরুয়া বসন পরে বনে চ'লে যাও।" মন্ত্রী বলিলেন—"কি উপায়ে প্রতিহিংসা নেব।" তখন স্ত্রীলোকটী নরম সুরে বলিল—"আজ নিমন্ত্রণে গিয়েছিলে ত।" বৃদ্ধমন্ত্রী বলিল—"হাঁ।" যুবতী বলিল—"আজ রাজবাড়ী যে কি কাণ্ড হয়েছে জান? যদি ব্রাহ্মণের সন্তান হও, যদি প্রকৃত বীর হও, তবে এর প্রতিশোধ লও।" বৃদ্ধমন্ত্রী বলিলেন—"কি হয়েছে?" যুবতী রাগতস্বরে বলিল—"তোমার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে। যদি মানুষ হও, তবে অদ্যই রাত্রে চলে যাও, বাদসাহের নিকট দরখাস্ত কর এবং এই দুষ্ট রাজার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে উত্তেজিত কর। আমি চল্লেম, একটি কথা বলে যাই—রাজার প্রতিহিংসাবৃত্তি ভয়ানক। অদ্য রাজবাড়ীতে কি মাংস ভক্ষণ করেছ জান? তোমার পুত্রকে বধ করিয়া তাহার মাংস মৃগমাংস বলিয়া তোমাকে আহার করাইয়াছে। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, তাই টের পাও নাই। যাও, এখনি চলে যাও, গৌড়ে গিয়ে দরখাস্ত পেশ কর।" এই কথা বলিয়াই যুবতী বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া গেল। মন্ত্রী এই সব কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিলেন।

বৃদ্ধ মন্ত্রী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। নানাবিধ চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। সত্যসত্যই কি রাজা এতদূর নিষ্ঠুর ও পাষাণ-হৃদয় যে, পুত্রের মাংস পিতাকে আহার করাইলেন। যুবতীর কথা কি সত্য? হইতে পারে। ইহার মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজন কি? স্ত্রীলোকটি কে? তাহার এ বিষয়ে মিথ্যা বলার কি স্বার্থ আছে? মন্ত্রীর মনে হইল এ স্ত্রীলোকটিকে কোথায় দেখিয়াছেন। অনেক চিন্তার পর স্মরণ হইল, এ যে ভুবনেশ্বরী, রাজবাটীতে থাকে, সমস্ত সংবাদ রাখে, অতএব তাহার কথা অবিশ্বাসযোগ্য নহে। বৃদ্ধের মন চঞ্চল হইল, ক্রোধে শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার? মন্ত্রীর আর হিতাহিত বিবেচনার ক্ষমতা থাকিল না। তিনি বলিলেন—"এমন

নিষ্ঠুর রাজার রাজত্বে বাস কর্‌তে নেই, আমি এখনই চল্লেম, ইহার প্রতিহিংসা নিব। মনে করেছে, আমি রাজা যাহা ইচ্ছা কর্‌তে পারি। দেখা যা'ক কি হয়,আমি শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌বো। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! রাজার দর্প চূর্ণ কর্‌বো। এতদূর দাম্ভিকতা? এতদূর সাহস? ব্রাহ্মণের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার? ভগবান এ সব দেখ্‌ছেন, এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হচ্ছে, এখনও পাপ-পুণ্যের বিচার হচ্ছে। আমার দোষ নাই, আমি অনেক সহ্য করেছি, এই বার আর পারিব না। হা পুত্র! তোমার পরিণাম কি এই হ'ল? আমি এর প্রতিশোধ নিব।" বলিতে বলিতে মন্ত্রী উন্মত্তপ্রায় হইলেন, তিনি ভুবনেশ্বরীর কথা মত চলিবেন স্থির করিলেন। আর বিলম্ব করিলে কার্য্য সিদ্ধির সম্ভাবনা কম, অতএব তখনই ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। একটী সিন্দুক হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গে লইলেন,এবং ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন। তারপর বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া অন্ধকারে কোথায় চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনী সকাশে।

ভীষণ অরণ্য, গাছের পর গাছ, তারপর আরও বৃহত্তর গাছ, লতাপাতায় চতুর্দ্দিক ঘেরা। চন্দ্র-সূর্য্যের রশ্মি সেস্থানে কখনও প্রবেশ করিতে পারে না, কাজেই তথায় চির-অন্ধকার বিরাজিত। সেই ভীষণ অরণ্যের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ আছে, তাহাও আবার স্থানে স্থানে কণ্টক বৃক্ষের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অরণ্য মধ্যস্থ বেতস-কুঞ্জ সকল বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া একপ্রকার শব্দ হইতেছে। সায়ংকাল অতীত হওয়ায় অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে। আকাশ মেঘাবৃত কি পরিষ্কার তাহা সেই অরণ্যের মধ্যে থাকিয়া জানিবার উপায় নাই। বনের মধ্যে দুই একটী ভগ্ন অট্টালিকা আছে, স্থানে স্থানে পঙ্কে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী—দেখিলেই অনুমান হয়, বহু পূর্ব্বে কোন ধনী লোকের বসতি ছিল। সেই সব স্থানে হিংস্র জন্তুগণের বাস। এই বনের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কুটীর, একজন সন্ন্যাসিনী তথায় ধ্যানে মগ্ন। সন্ন্যাসিনী নির্ভয়--শ্বাপদদিগকে গ্রাহ্য করিতেছেন না। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসিনী উঠিলেন, এবং কিঞ্চিৎ ফলাহার করিয়া ঐ কুটীরেই শয়ন করিলেন।

রাত্রি অনেক হইয়াছে, বন্যজন্তুগণের ভীষণ গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে কুটীরের বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল। সন্ন্যাসিনী উঠিয়া দ্বার খুলিয়া বলিলেন—"ঠাকুর এসেছেন?" সন্ন্যাসী দেবদাসকে সঙ্গে লইয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দেবদাসকে দেখিয়া সন্ন্যাসিনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"প্রভো! এ বালক কে?" সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"পাপী দেবদাস, প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে এসেছে। এখন আর সে দেবদাস নাই তাহার পরিবর্ত্তে অন্য এক দেবদাসকে সঙ্গে এনেছি।" সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"দেবদাস কি আপনার চরণে স্থান পেয়েছে?" . সন্ন্যাসী বলিলেন—"দেবদাস ভগবানের চরণে স্থান পেয়েছে, আমি সামান্য মানব মাত্র। এখন

তোমরা দু'জনে আলাপ পরিচয়াদি কর, আমি কার্য্যান্তরে চল্লেম, ফিরে এসে অন্যান্য ব্যবস্থা করবো।" সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু এ বালকের কি ধর্মজ্ঞান জন্মেছে?" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—"সে বিশ্বাস না থাকৃলে দেবদাসকে এখানে নিয়ে আসৃতেম না। কোন চিন্তা নাই, দেবদাস এখন প্রকৃত দেব-দাস।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসিনী বলিলেন —"ভাই দেবদাস, কিছু খাবে?" দেবদাস বলিল—"না ভগ্নি! আহারে রুচি নাই। বিশেষতঃ আজ আমার প্রায়শ্চিত্ত রজনী, আজ রাত্রে কিছুই আহার করিব না। আমি মহাপাপী, প্রভু আমার প্রাণরক্ষা করিয়া চরণে স্থান দিয়াছেন। এখন আর আমার এ প্রাণের বা শরীরের উপর আমার কোন অধিকার নাই। এ দেহে এখন প্রভুর সম্পূর্ণ অধিকার। প্রভুর কি অদ্ভুত ক্ষমতা, কি অদ্ভুত দয়া! স্বয়ং ভগবানের অংশে জন্ম না হইলে এমন ক্ষমতা সামান্য মানবে সম্ভবে না। ভগ্নি! তুমি আমাকে ছোট ভাই ব'লে দয়া করিও, আর কিছুই চাই না।" সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"দেবদাস! ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। বোধ হয় তোমাকে এইরূপ সৎপথে আনিবার জন্যই ঈশ্বর তোমার কুমতি দিয়াছিলেন। 'কু' হইতেই 'সু' এর উৎপত্তি। ভাই! মহাপাপী দস্যু রত্নাকর যেরূপ বাল্মীকি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, পাপী বিল্বমঙ্গল যেরূপ ভক্ত বিল্বমঙ্গল হ'য়ে হরির দেখা পেয়েছিলেন, তুমিও সেইরূপ ঈশ্বরকে পাইবে; কিন্তু ভাই! আর যেন পাপস্পৃহা হৃদয়ে কখনও স্থান দিও না। আর এক কথা, তুমি যদি একবার মানস-সরোবর-কূলে প্রভুর আশ্রমে যাও, তবে তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব ভুলে যাবে—পাপ-চিন্তা হৃদয়ে আবির্ভাব হইবে না—শোক-তাপ ভুলে যাবে—সংসারের জ্বালা আর ভোগ কর্ত্তে হবে না—পিতা মাতা, ভাই-বন্ধু কেহই তখন আর হৃদয়ে স্থান পাইবে না। এমন শান্তি-নিকেতন আর কোথাও পাইবে না। ভাই! তুমি একদিন সে স্থান দেখ্‌বে? তথায় পশু, পক্ষী পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে বাস কচ্ছে—তাই সে স্থানের নাম—'শান্তিকুঞ্জ'।" দেবদাস শান্তিকুঞ্জের এবম্বিধ বর্ণনা শ্রবণ করিয়া, একেবারে মোহিত হইল। মনে মনে ভাবিল—কবে এমন স্থানে যাইতে পারিব? তারপর বলিল—"ভগ্নি! তুমি কি কখনও এমন স্থানে গিয়েছিলে?" সন্ন্যাসিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আমি সে স্থানে অনেক দিন ছিলেম, সে স্থানে প্রভু নিয়ত বাস করেন, তবে রাজা তাঁহার প্রিয় শিষ্য, রাজার প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ, তাই রাজার উপস্থিত বিপদ দেখিয়া আমাকে সঙ্গে ক'রে এদেশে এসেছেন। আমি সেখানে বাবার সেবাশুশ্রূষা করি। বাবা আমাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন।" দেবদাস বলিল—"আপনি কি প্রভুর কন্যা নন?" সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন—"সন্ন্যাসী কি কখনও বিবাহ করে? তোমার সে জ্ঞান এখনও কি হয় নাই?" দেবদাস বলিল—"তবে তিনি আপনার কে?" সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"তিনি আমার ধর্ম্মপিতা, আমি বাল্যাবধি এই পিতার দ্বারা লালিত-পালিত হইয়া সেই মানস-সরোবরের শান্তিকুঞ্জে

বর্দ্ধিতা হয়েছি। আমার অন্য পরিচয় পরে জান্‌তে পারবে। এখন তুমি সৎপথে থেকে ভগবানকে ডাক, তিনি তোমায উদ্ধার কর্‌বেন, দয়াময়ের অসীম দযা।" দেবদাস মনোযোগ সহকারে এই সকল কথা শুনিল, তারপর প্রাণের আবেগে বলিল—"ভগ্নি! অনেক পাপ করেছি, আশীর্ব্বাদ কর,আর যেন সে পথে যেতে না হয়। যখন একবার 'তাঁর' কোলে আশ্রয পেয়েছি, আর আমি ভয করি না। অধিকন্তু আমার এখন আশা হচ্ছে যে, আমি সমযে সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের পবিত্র চরণে স্থান পাইব।" এইরূপ নানা কথাবার্ত্তায রাত্রি অনেক হইল। সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"এখন শযন কর, রাত্রি অনেক হযেছে, আমি অদ্য সমস্ত রাত্রি ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিব।" দেবদাস বলিল—"ভগ্নি। অদ্য আমার নূতন জীবনে প্রবেশ, আমি আহার ও নিদ্রা অদ্যকার মত ত্যাগ করিয়া তোমার পথানুসরণ কর্‌ব। দেখি এ মহাপাপী ভগবানকে ডাকিতে পারে কি না? আমি মহাপাপী, 'তাঁর' চরণতলে আশ্রয় চাই।" দেবদাস এই পর্য্যন্ত বলিযা ক্ষান্ত হইলে, তখন দুইজনে দুইস্থানে ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর আর কোন কথা হইল না। ক্রমশঃ

শ্রীঅমলানন্দ বসু।

তার দান।

মার্ত্ত-হারা বাল্লাঙলি! আয়, কাছে আয়,
তোমরা তার দান;
তোদের ধরিলে বুকে তারে পাওয়া যায়,
বিচিত্র বিধান!
কারো মুখে তার হাসি; কারো চোখে ফুটে
তাহার সোহাগ;
কারো বুকে অভিমান তারি মত লুটে
ভরা অনুরাগ।
একা তারে নিযে ছিনু, আজ সবে মিলি'
তারে নিযে আয়;—
যেটুকু জানিনি তার, তাও খুলে দিলি
আজি এ হিযায়।

* *

নহে স্বপ্ন—পূর্ণ সত্য—প্রেমময়ী জাযা
নিজ গন্ধরূপ
পুঞ্জীভূত করি' ধরে ফেলি' পুষ্প-কাযা
ফলের স্বরূপ।

শ্রীভুজঙ্গধর রায চৌধুরী।

রূপহীনা।

বিষাদ কালিমা গরিমা ঢেকেছে
অধরে আঁখির পরে,
বিকশিত-স্মিত-কুসুমে যেন রে
সমীর চুমিছে ধীরে।
ঊষার অরুণ চুমিত রক্ত
শ্যামল কপোলা প্রকৃতি,
দিবস রাতিতে বাদল মলিনা
জলদে এঁকেছে বিভূতি;
(ছিল) জীবন প্রভাতে অমল আভাতে
মন-নিকুঞ্জ সজ্জিত
(হ'ত) গন্ধ বিভোর মৃদু মধুর
মর্ম্মর তানে কম্পিত।

(তবে) আজি এ কেমন ধ্যান-নিমগন
মহাযোগী হেন শান্ত,
(তবে) কেন মনে হয় দেখা যায় যেন
আশা-বারিধির অন্ত!
স্নেহ সুশীতল আঁখিজলে তব
তাপিত পাথর জুড়াত,
ফোয়ারার জল বেঁধে কি জমাট
হতেছে তুষার পূরিত?
আগে যারে চিতে পূজিতে বিরলে
প্রেমবারি দিতে চরণে,
প্রেমের সে হরি পর করি দিলে
বসালে অরির আসনে।
তবু সে যে তব চির আপনার
তোমারি দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
ধূলি কণাটীও ভুলিতে পারি না
তৃণ সনে আসে ভাসিয়ে।
নীলিমার মাঝে ঝিলিমিলি আলো।
তোমারি তরে গো সাজান,
বসুধার বুকে হরিত বরণ
শস্য কাঁচলি পরাণ।
অনাথার দু'টী ব্যথিত নয়ন
তোমারি আঁচল যাচে গো,
তোমারি স্নিগ্ধ কর পরশের
আশার স্বপনে বাঁচে গো।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র।

সেবা-ধর্ম্ম।

মনে পড়ে, অনেক দিন অতীত হইল, তবু এখনও মনে পড়ে, ভুলিয়া গেলেও পথে ঘাটে মাঠে বাহির হইলে পথের আশে পাশে চাহিয়া মনে পড়ে; সহর হইতে পল্লীর নীরব পথে, জীর্ণ অট্টালিকার অভ্যন্তরে দৃষ্টি পড়িলেও মনে পড়ে, পল্লী হইতে সহরে আসিয়া ফুট পাথের পাশে বা ট্রাম-লাইনের ধারে ভিক্ষোপজীবি শীর্ণ দেহ, ছিন্ন বসনধারী মূর্ত্তিগুলির পানে চাহিলেও মনে পড়ে—সেই শ্রুত সঙ্গীতের এই পদগুলি—"

"মানব জীবন তাহারি সার মানবে যে জন দয়া করে।
জীবের দুঃখে কাতর যে জন পর উপকার অন্তরে॥
সারের সার রত্ন হারায়ে ছুটি অন্ন তরে ফিরি পরের দ্বারে।
জ্ঞানবান সেই সেজন, যাঁদের হৃদয় কাঁদে মোদেরি তরে॥
আশ্রয়হীনা অনাথিনী কত, ভিক্ষা মাত্র সার সংসারে।
পুণ্যবান সেই সেজন, আমাদের যেবা দয়া করে॥
কত অনাথ অনাথা, বালক বালিকা, ক্ষুধার জ্বালায় ছুটে কাতরে।
মানবের সার দেবতা সেই, যে জন মোদের দয়া করে।"

তা এ গীতটী যখনই মনে পড়ে, তখনই ভাবি। অন্তরের অন্তস্থল হইতে কত ভাবের ঝঙ্কার উথলিয়া উঠে। মনে হয়,—আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক দুঃখের কথা,—আর "দুঃখস্য অত্যন্ত নিবৃত্তি সুখম্।" আর মনে হয়,—বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ তত্ত্বের যে

অবিরত প্রয়াস। কিন্তু, তদপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে স্মৃতিপথ আলোকিত করে, সেই নবদ্বীপচন্দ্রের শ্রীমুখের সুধামাখা বাণী—

"জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন,
এর চেয়ে ধর্ম্ম নাই, শুন সনাতন!"

এ তত্ত্বের কথা, দর্শনের কথা, নানা ভাবে নানা স্থানে আলোচিত হয়। কত গ্রন্থে, কত ছন্দে কত ব্যাখ্যাই না প্রকাশিত হয়। তাহারই ভাব লইয়া, তাহারই মর্ম্ম বোধ করিয়া, কোন কোন উদারচেতা জীব-দুঃখ কাতর মহানুভব ব্যক্তি স্থানে স্থানে "সেবা-সদন", "অনাথ-আশ্রম", "দরিদ্র-ভাণ্ডার" প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সেবা-ধর্ম্মেরই পরিচয় দান করিতেছেন।

অনেকেই সেবা-ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই ভাবের একটা না একটা কিছু অনুষ্ঠান বুঝিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, দীক্ষা, আচার ব্যবহার যেমন হইযাছে, অবশ্য ধর্ম্ম পালনের অনুষ্ঠানও তদনুরূপ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে কথা আছে, হিন্দুর চিন্তা করিবার কথা আছে, সকল অনুষ্ঠানের মূল কেন্দ্রে লক্ষ্য কি তাহা চিন্তা করিবার প্রয়োজন আছে। একথা বলিবার কারণ এই যে, যাহা এ দেশের প্রকৃতিগত, এদেশের অস্থি মজ্জায় মিশিয়া আছে, এ দেশের অনিলে-অখিলে-সলিলে যাহার তন্মাত্রা ব্যাপিয়া রহিয়াছে—তাহার যদি তিলমাত্র অনুষ্ঠান করা যায়, তবে সেটা অতি সহজেই প্রাণে প্রাণে লাগিয়া যায়। আর প্রাণে না লাগিলে কোন কর্ম্মেই আন্তরিকতা প্রকাশ পায় না। যাহা আন্তরিক নহে, যাহা বাহ্যিক আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় বা হুজুগে ভাসিয়া আসে, তাহার স্থায়িত্ব থাকে না। তাহা স্রোতে ভেসে আসা শৈবালের মত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া, আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। কিন্তু দেশে সেবা ধর্ম্মের যে অনুষ্ঠান ইদানীং প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, এ অনুষ্ঠানে সে চপলতা নাই, থাকিতে পারে না। কারণ ইহা এ দেশের, এ জাতির প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। একবার এ প্রকৃতি পাঠ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলেই লক্ষ্য স্থির হয়। আর যেখানে লক্ষ্য স্থির—সেখানে সাধনা অটুট থাকে।

হিন্দুর নিকট, সেবা ধর্ম্মের সে প্রকৃতি কি তাহা বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবু বলি, সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলি, যাহারা শুনিতে চান, তাহাদের জন্য বলি—এ বিশ্ব যাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে চালিত পালিত হইতেছে—সেই সর্ব্বশক্তিময়ী, দয়াময়ী কত না ব্যাপারে আমাদিগকে সেবা-ধর্ম্মের প্রকৃতি পাঠ করাই-তেছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়াই ত ভারতের ভবিষ্যত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ গাহিয়াছিলেন—

যা দেবী সর্ব্বভূতেযু চিতিরূপেণ সংস্থিতা
যা দেবী সর্ব্বভূতেযু জ্ঞানরূপেণ সংস্থিতা
যা দেবী সর্ব্বভূতেযু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা
ইত্যাদি।

আহা! একি আনন্দের লীলাখেলা। জীবকে, জড়কে, তাঁহার প্রকৃতি অনুযায়ী পরিপোষণ করিবার জন্য, আনন্দময়ী, সর্ব্বশক্তিময়ী, দয়াময়ী কত না ভাবে কত না কৌশলে—সেবা-পরায়ণা হইয়াছেন। একই মাটীতে ইক্ষু ও লঙ্কা বীজ বপিত হইলেও—উহাদের স্বতন্ত্র প্রকৃতির পরিপোষণ উপযোগী রসরূপে, সেই